লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ২য় ও ৩য় সংখ্যা

ঈদুল আযহা সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৩ জিলহজ্ব, ১৪৪০ হিজরি | ১৫ জহুর, ১৩৯৮ হি. শা. | ৩১ জুলাই ও ১৫ আগষ্ট, ২০১৯ ঈসাব্দ

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

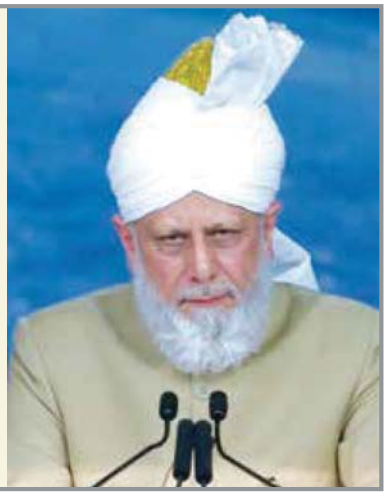

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ
اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ
الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمْ یَلِدْ ۙ
وَ لَمْ یُوْلَدْ ﴿۴﴾ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾
وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ
النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ﴿۵﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۳﴾
اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿۵﴾
الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿۶﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

অবাধ্য আত্মাকে জবাই করাই হলো প্রকৃত কুরবানী

কুরবানী: মন্দ কর্মে প্ররোচিতকারী অবাধ্য আত্মাকে জবাই করে–

সেই ইবাদত যা পরকালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে তা হলো, নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য আত্মাকে জবাই করা। আর এই আত্মা যা মন্দকর্ম করায় বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে আর এই নফসে আম্মারা হলো এমন এক নির্দেশদাতা, যে সর্বক্ষণ মন্দ ও অন্যায় কর্মের আদেশ দিতে থাকে। অতএব, কুরবানীকারী মন্দকর্মের নির্দেশদাতা নফসে আম্মারা-কে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচ্ছিন্নকারী ছুরি দিয়ে জবাই করে দেয়। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ: ৩৫)

কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের বাহন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'প্রকৃত কুরবানী হলো এমন এক বাহন যা খোদা তা'লার নৈকট্যে পৌঁছায়। আর ভয়, শঙ্কাকে প্রশমিত করে কুরবানীদাতার বিপদাবলী নির্বাসিত করে ছাড়ে। এজন্য কুরবানী যথার্থই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। (খুতবা ইলহামীয়া, পৃ: ৪৪-৪৫)

কুরবানী: জীবন ও মরণ-কে জুড়ে দেয়

অতএব, ঐ গোপন রহস্যের প্রতি খোদা তা'লার কালাম ইঙ্গিত দেয়, চির সত্যের ধারক যিনি। তিনি তাঁর রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ করে বলেন ঐসব লোকদেরকে বলে দাও যে, "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা, আর আমার মৃত্যুবরণ করা সবটাই খোদা তা'লার জন্য, যিনি জগতসমূহের অধিপতি"।

অতএব অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর নুসক (কুরবানী) শব্দটিতে হায়াত (জীবন) ও মুমাত (মরণ) শব্দ দু'টিকে সঠিক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কত সুন্দর ও সঠিকভাবে একই সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৩)। অর্থাৎ মরণেই জীবনের উত্থান।

গৃহীত কুরবানী এক সচল ধারা: মহান এক পুরস্কার

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে স্বচ্ছ অন্তরে নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরবানী করলে কুরবানী দাতা নিজেকে, নিজের পুত্রদেরকে ও পৌত্রদেরকেও কুরবানীতেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আর একারণে তার জন্য সম্মানিত মহান এক পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে যায় যেমনটা লাভ হয়েছিলো হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৪)। আর পরিণামে জগত পেয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-কে।

পবিত্র এই কুরবানীর ঈদ, আমাদের করা পশু কু রবানীকে ছাপিয়ে প্রকৃত অর্থেই আমাদের নফসের কুরবানী হয়ে উঠুক আর মহান আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করে আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) করা কুরবানীর পুরস্কারের ভাগী করুন। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত মহান পুরস্কারে উদ্ভাসিত হোক।

সকলকে আগাম ঈদ মুবারক

ঈদুল আযহার আগাম শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মহান পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অনন্য আত্মোৎসর্গের মহিমায় সকলে উদ্ভাসিত হোন এই কামনা করি এবং সেই সাথে পবিত্র ঈদুল আযহা সবার জীবনে বয়ে আনুক অনেক অনেক আনন্দ আর কল্যাণ।

সূচিপত্র

৩১ জুলাই ও ১৫ আগষ্ট ২০১৯

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)	৬
লণ্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২২ আগষ্ট ২০১৮, মোতাবেক ২২ যহুর, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র **ঈদুল আযহার খুতবা**	১০
ঈদুল আযহার তাৎপর্য ও আমাদের করণীয় মাহমুদ আহমদ সুমন	১৬
কবিতা– নবীজি (সা.)-এর সালাম সিবগাতুর রহমান	১৭
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সঠিক সময়ে আগমনকারী এক প্রেরিত পুরুষ মোহতরম মোহাম্মদ লুকমান মাজোকা	১৮
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল	২৪
শান্তির আলোক বর্তিকা	২৭
'মেহেদী উৎসব' সম্পর্কে যুগ-খলীফার তাজা দিকনির্দেশনা	৩১
ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি খন্দকার আজমল হক	৩৩
মানবকৃত অপরাধ দানবকেও হার মানায় কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	৩৮
মুতাশাবিহাত (রূপক বর্ণনা) মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর	৪১
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (২০১৯-২০২২)	৪২
সংবাদ	৪৩

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল হাজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে ঢলে পড়ে তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লিখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এ হচ্ছে আল্লাহর এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরো প্রমাণ করে, কুরবানীকৃত পশুর গোশত সঠিকভাবে বণ্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জ্বলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ আল্লাহ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাকওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ তা'লা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন- আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তা'লা পশুর রক্ত ও মাংস আমাদের নিকট চান না এবং আশাও করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। এও সত্য, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ তার শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য হজ্জ ফরজ করেছেন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।' এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য?' হুযূর (সা.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তাহলে কষ্টের কারণে তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতেও না। হজ্জ একবার। যে তার অধিক করল, সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল।' (আহমদ, নিসাঈ ও দারেমী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা,) বর্ণনা করেছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কিসে ফরয হয়?' হুযূর (সা.) জবাব দিলেন 'পথের পাথেয় এবং বাহনের নিশ্চয়তা থাকলে।' (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু রজীন উকাইলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন! আমার পিতা অতিবৃদ্ধ। সে হজ্জ ও উমরাহ করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনেও বসতে পারে না।' হুযূর (সা.) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরাহ পালন কর।' (তিরমিযী আবু দাউদ ও নিসাঈ)

হযরত আসেম ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি (রা.) বলেছিলেন, "(ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দুটির মধ্যে 'তাওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। তাই আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, 'সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ' করা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরাহ্ করবে সে যদি এ দুটির তওয়াফ করে তবে তাতে তার গোনাহ্ হবে না" (বুখারী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকে মনে করত যে, হজ্জের সময় ব্যবসা করা পাপ। পরবর্তীতে এ আয়াত নাযেল হয়, 'তোমাদের জন্য কোন পাপ নয় যে, (হজ্জের দিনগুলোতে) তোমাদের নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। (২ : ১৯৯) (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইয়েমেনবাসীরা হজ্জ করত কিন্তু পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী।' কিন্তু যখন মক্কায় পৌঁছাত, তখন মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইত। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন, 'পাথেয় সঙ্গে লও, আর উত্তম পাথেয় হল তাক্‌ওয়া (অর্থাৎ অন্যের নিকট না চাওয়া)" (বুখারী)।

'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।'

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। (সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩০তম কিস্তি)

(২১) একুশতম আয়াত: 'মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন।' (সূরা আহযাব ঃ ৪১) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদের মাঝে কারও পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের 'খতমকারী (তথা পরিপূর্ণতা সাধনকারী)।' এ আয়াতটিও প্রমাণ করছে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে দুনিয়ায় (স্বাধীন-স্বতন্ত্র ও শরীয়তবাহী) কোনো নবী রসূল আসবেন না'। এতেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' দুনিয়ায় আসতে পারেন না, কেননা তিনি আল্লাহ্‌র নবী বা রসূল। নবী ও রসূলের প্রকৃত মর্ম ও মূলতত্ত্বে এ বিষয়টি নিহিত যে, ধর্মীয় সার্বিক জ্ঞান তিনি জিব্রাঈলের মাধ্যমে লাভ করে থাকেন। আর এখনই প্রমাণিত হয়েছে যে, রিসালতমূলক ওহীর ধারা কিয়ামতকাল অবধি বিচ্ছিন্ন। এতে করে অবশ্যই মানতে হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) আর কখনও আসবেন না। আর এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃত্যুর পর তিনি পুনর্জীবিত হয়েছেন– এ ধারণাটিও আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কোন কাজে আসতে পারে না। কেননা পুনর্জীবিত হলেও তাঁর রিসালত যা আবশ্যকীয়ভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত এক অবিচ্ছেদ্য গুণস্বরূপ, যা তাঁকে দুনিয়ায় আসতে বাধা দেয়। তাছাড়া আমরা বর্ণনা করে এসেছি, তাঁর পুনর্জীবিত হওয়া সেরকম নয় যেমনটি ধারণা করা হয়েছে। বরং শহীদগণের জীবনের মত এতে ঐশী নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্যমূলক মর্যাদাসমূহ লাভ হয়ে থাকে। এ প্রকারের জীবনের বর্ণনা কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। সুতরাং হযরত ইবরাহীমের জবানীতে কুরআন করীমে লিপিবদ্ধ এ আয়াত রয়েছে: **'হুয়াল্লাযী-ইউমীতুনি সুম্মা ইউহ্‌য়ীনি'** (সূরা শুআরা ঃ ৮২) অর্থাৎ তিনিই আমাকে মৃত্যু দেন, এবং পুনরায় জীবিত করেন।' উল্লেখিত এই মৃত্যু ও জীবন দ্বারা কেবল জাগতিক মৃত্যু ও জীবন বুঝায় না। বরং সেই মৃত্যু ও জীবনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, ঐশী পথের পথিক ও তাঁর পানে বিচরণকারীদের যে-সব মঞ্জিল অতিক্রম করতে যার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব সে সৃষ্টির প্রতি সাক্ষাৎ ভালবাসা থেকে এক প্রকার মৃত্যুবরণ করে এবং প্রকৃত সৃষ্টি-কর্তার প্রতি সাক্ষাৎ ভালোবাসার গুণে তাকে জীবিত করা হয়। অত:পর নিকটবর্তী সাথী ও বন্ধুদের ভালোবাসা থেকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং উচ্চতম বন্ধু আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ভালোবাসা দ্বারা তাকে জীবিত করা হয়। অত:পর স্বীয় প্রাণের প্রতি ভালোবাসা বিসর্জনে তাকে এক মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ ভলোবাসায় তাকে জীবিত করা হয়। এমনি ধারায় বহু রকম মৃত্যু এবং জীবন তার ওপর আপতিত হতে থাকে। এমন কি পরিশেষে পরিপূর্ণ জীবন লাভের মার্গে সে উপনীত হয়ে থাকে। অতএব সেই পরিপূর্ণ জীবন যা এই পার্থিব নিম্নস্তরের জীবন বিসর্জনের পর মিলে থাকে– সেটি জড়দেহের জাগতিক জীবন নয়। বরং আলাদা রঙের শান ও মর্যাদার জীবন। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ **"ইন্নাদ্ দারাল্ আখিরাতা লাহিয়াল্ হাইওয়ান লও কানু ইয়া'লামুন।"** (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৫) অর্থাৎ 'আর নিশ্চয় পরকালের আবাসই চিরস্থায়ী জীবনের আবাস। হায়! যদি তোমরা জানতে।'

(২২) বাইশতম আয়াত: 'ফাস্‌য়ালু আহ্‌লায্ যিকনি ইন্ কুনতুম লা তা'লামুন' (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪৪)। অর্থাৎ তোমাদের মাঝে উদ্ভুত কিছু প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকলে সে সম্পর্কে তোমরা 'আহলে কিতাবে'র দিকে মনোযোগ দাও এবং তাদের পুস্তকাবলীতে লেখা ঘটনাবলীতে দৃষ্টিপাত কর, যাতে

প্রকৃত সত্য তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। অতএব আমরা যখন উক্ত আয়াতের আদেশ অনুযায়ী আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কিতাবাদিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং জানতে চাই যে, কোনো বিগত নবীর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি থাকলে তিনিই কি চলে আসেন। অথবা অনুরূপ প্রশ্নবিদ্ধ এক বিষয়ে হযরত ঈসা (আ.) নিজে বিচার-নিষ্পত্তিমূলক রায় প্রদান করেছেন। তাঁর সেই রায় ও ফয়সালার সাথে আমাদের রায়ের ঐকমত্য রয়েছে। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তক ও মালাকী নবীর পুস্তক এবং ইঞ্জিল দ্রষ্টব্য– সেখানে আকাশ থেকে এলিয়া নবীর অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কিভাবে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম বর্ণনা করেছেন।

(২৩) তেইশতম আয়াত: "ইয়া আইয়াতুহান্ নাফ্‌সুল্ মুত্‌মায়িন্নাতুরজিয়ী ইলা রাব্বিকি রাযিয়াতাম্ মারযিয়া্ ফাদ্‌খুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি" (সূরা আন্ নাহ্‌ল) অর্থাৎ, 'হে সত্যিকার শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে চলো। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর পরলোকগত আমার ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার বেহেশ্‌তের ভেতরে প্রবেশ কর।" এ আয়াতটি থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, মানুষ যতক্ষণ মৃত্যুবরণ করে না ততক্ষণ পরলোকগত লোকদের দলে কখনও প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস থেকে সপ্রমাণিত যে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম পরলোকগত নবীগণের দলে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত হাদীসটি ইমাম বুখারীও তাঁর সংকলিত সহীহ্ হাদীসগ্রন্থে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব প্রামাণ্য ও প্রাঞ্জল এই ভাষ্য অনুযায়ী মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্ (আ.) এর মৃত্যুবরণ আবশ্যকীয়ভাবে স্বীকার করতে হলো।

'আমান্না বিকিতাবিল্লাহিল্ কুরআনিল্ করীম ওয়া কাফারনা মা ইউখালিফুহু ইয়া আইউহান্নাস ইত্তাবিয়ু মা উনযিলা ইলাইকুম মির্-রাব্বিকুম ওয়ালা তাত্তাবিয়ু মিন দূনিহি আওলিয়া ক্বাদ্ জায়াতকুম মওয়েযাতুম্ মির্‌রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল্ লিমা ফিস্ সদূর ফাত্‌তাবিয়ূহু ওয়ালা তাত্তাবিয়ুস্ সুবুলা ফাতাফার্‌রাকা বিকুম্ আন্ সাবীলিহি।'

(অনুবাদ: 'আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন করীমে ঈমান এনেছি এবং যা তার বিরোধী তা সবই আমরা অস্বীকার করি। হে মানব সকল! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য বন্ধু বা অভিভাবককে অনুসরণ করো না। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহান উপদেশ এসেছে এবং মানুষের হৃদয়ের সব ব্যাধির আরোগ্যদানের ব্যবস্থাপত্রও সমোপস্থিত। অতএব তোমরা তা মেনে চল। এছাড়া বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না যাতে সেগুলো তোমাদেরকে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়।' –অনুবাদক)।

(২৪) চব্বিশতম আয়াত: "আল্লাহুল্ লাযী খালাকাকুম সুম্মা রাযাক্বাকুম সুম্মা ইউমিতুকুম সুম্মা ইউহ্‌য়িকুম।" [(অর্থঃ তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের রিয্‌কদান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবনে (এবং) এরপর তোমাদের জীবিত করবেন (সূরা আর্ রূম ঃ ৪১) –অনুবাদক] এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জীবনে কেবল চারটি ঘটনা বিদ্যমান। প্রথমে তাকে সৃষ্টি করা হয়। এরপর পরিপূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ঐশী-বন্টনকৃত 'রিয্‌ক' বা জীবনোপকরণের নির্ধারিত ভাগ তাকে দান করা হয়। এরপর তাকে মৃত্যু দেয়া হয় এবং এরপর তাকে জীবিত করা হয়। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ আয়াতসমূহে ব্যতিক্রমধর্মী এমন কোনো কথা (বা নির্দেশনা) নেই যার দরুন হযরত মসীহ্‌র স্বতন্ত্র ঘটনাবলীকে (উল্লেখিত এই সর্বব্যাপক কানুনের আওতার) বাইরে রাখা যায়। অথচ কুরআন করীম আদ্যপান্ত এই রীতি বলবৎ রেখেছে যে, কোনো ঘটনা উল্লেখ করার বেলায় কোন একজন ব্যক্তিও এর বাইরে রাখার উপযুক্ত হলে তাকে উল্লেখিত বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী ঐ ঘটনা থেকে বাদ দেয়া হয়। অথবা তার স্বতন্ত্র ঘটনাবলী (পৃথক) বর্ণনা করে দেয়া হয়।

(২৫) পঁচিশতম আয়াত: "কুল্লুমান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম" (সূরা আর্ রহমান)। অর্থাৎ পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং পৃথিবী থেকে বহির্গত প্রতিটি বস্তু লয়ের অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সেটি লয়ের দিকে সচল এবং কোনো সময়ই এ সচলতা থেকে মুক্ত নয়। এ সচলতাই শিশুকে যৌবনে নিয়ে যায় এবং যুবককে বৃদ্ধে পরিণত করে। অতঃপর বৃদ্ধকে কবরস্থ করে। কেউই প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়। আয়াতটিতে খোদা তা'লা 'ফানিন' শব্দ অবলম্বন করেছেন। 'ইয়াফ্‌নি' (সে লয় প্রাপ্ত হয়) শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। যাতে জানা যায় যে, 'ফানা' বা লয় এমন বিষয় নয়, যা ভবিষ্যতকালে এক সময় হঠাৎ সংঘটিত হবে। বরং 'লয়ে'র চলমানতা প্রতিনিয়ত অব্যাহত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মৌলবী সাহেবান মনে করছেন, মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্ (আ.) এই নশ্বর জড়দেহসহ কোনো পরিবর্তন-বিবর্তন ছাড়াই আকাশে বসে আছেন এবং সময়কাল তাঁর ওপর প্রভাব ফেলে না। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতটিতেও মসীহ্ (আ.)-কে এ বিশ্ব-জগতের মাঝে বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু বলে নির্ধারণ করেন

নি। হে 'হাযারাত' (মহত্তম) মৌলবী সাহেবান! কোথায় গেল আপনাদের তৌহিদ এবং কুরআন করীম মেনে চলার দাবী?! **'হাল্ মিনকুম রজুলুন ফি ক্বলবিহি আয্‌মাতুল কুরআনি মিসক্বালা যার্‌রাতিন?'** (অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে তার হৃদয়ে কুরআন করীমের প্রতি কণা পরিমাণ মহাত্ম্যবোধ লালন করে?!)।

(২৬) ছাব্বিশতম আয়াত: "ইন্নাল্ মুত্তাকীনা ফিজান্নাতিন ওয়া নাহরিন ফি মাক্বআদি সিদ্‌ক্বিন ইন্দা মালীকিন্ মুক্বতাদির।" (সূরা আল কামার ঃ ৫৫, ৫৬) অর্থাৎ, 'নিশ্চয় সেই সকল মুত্তাক্বী যারা আল্লাহকে ভয় করে সবরকম অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে, তারা মৃত্যুর পর জান্নাতের বাগান ও নহরের মাঝে, সত্যতার চিরস্থায়ী আসনে, সর্বশক্তিমান অধিপতির সান্নিধ্যে বাস করবে।' এ আয়াতসমূহের আলোকে স্পষ্টত প্রতিভাত যে, খোদা তা'লা জান্নাতে প্রবেশ ও সত্যকার চিরস্থায়ী আসনের মাঝে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা রয়েছে– একটিকে আরেকটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। অতএব **'রাফিউকা'**-এর অর্থ যদি এ-ই হয় যে, 'হযরত মসীহ্‌কে আল্লাহ্ তা'লার দিকে উঠানো হয়েছে', তাহলে তিনি নিশ্চয় জান্নাতেও প্রবেশ করেছেন। যেমন কিনা অপর একটি আয়াত: **'ইরজিয়ী ইলা রাব্বিকা'** যা **'রাফিউকা ইলাইয়া'**-এর সমার্থক, এতে বিশদভাবে প্রমাণিত হয় যে, (১) খোদা তা'লার দিকে উত্থিত হওয়া, (২) বিগত ঐশী নৈকট্য-প্রাপ্তদের দলভুক্ত হওয়া এবং (৩) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা– এ তিনটি বিষয় একই সূত্রে গ্রথিত বলে একই মুহূর্তে পূর্ণতা লাভ করে থাকে। অতএব উল্লিখিত আয়াতটিতেও মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যুবরণ প্রমাণিত হলো। **'ফাল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযি আহাক্ কালহাক্কা ওয়া আবতালাল্ বাতিলা ওয়া নাসারা আব্দাহু ওয়া আইয়াদা মামুরাহু।'** (–অতএব সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন ও মিথ্যাকে বাতিল প্রতিপন্ন করলেন এবং তাঁর প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করলেন' –অনুবাদক)।

(২৭) সাতাইশতম আয়াত: "ইন্নাল্লাযীনা সাবাক্বাত্ লাহুমুল্ হুস্‌না উলাউকা আনহা মুবআদূন লা ইয়াস্‌মাওউনা হাসীসাহা ওয়া হুম ফিন্নাশ্‌ত হাত্ আনফুসুহুম খালিদূন।" (সূরা আল্ আম্বিয়া : ১০২, ১০৩)। অর্থাৎ যারা জান্নাতি এবং তাদের জান্নাতি হওয়া আমাদের পক্ষ থেকে (কল্যাণস্বরূপ পূর্বেই) অবধারিত হয়েছে, এ (দোযখ) থেকে তাদের দূরে রাখা হবে এবং তারা বেহেশতের চিরস্থায়ী সুস্বাদসমূহে অবস্থান করবে।' এ আয়াত বর্ণিত অর্থে হযরত উযায়র এবং মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম (আ.) শামিল রয়েছেন (এতে তাদের উভয়কে বুঝায়)। এতে করে তাঁদের জান্নাতে প্রবেশ প্রমাণিত হয় আর তাতে অবলীলায় তাঁদের মৃত্যুবরণও প্রতীয়মান হয়।

(২৮) আঠাইশতম আয়াত: "আইনামা তাকুনু ইউদ্ রিককুমুল্ মওতু ওয়া লও কুন্‌তুম ফি বুরুজিম্ মুশাইয়াদাহ্" (সূরা আন্ নিসা)। অর্থাৎ, যেখানেই তোমরা থাক না কেন, সেখানেই মৃত্যু তোমাদের অবশ্যই পাকড়াও করবে। এমন কি, যদি সুরক্ষিত-সুউচ্চ দুর্গসমূহে বসবাস কর তবুও।' (এ আয়াতটিতেও বিশদভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু ও এর আনুসঙ্গিক উপকরণাদি প্রত্যেক জায়গায় (রক্ত-মাংশের) জড়দেহে আপতিত হয়ে থাকে। এটাই 'সুন্নাতুল্লাহ্'- তাঁর অটল নিয়ম। এখানেও এমন কোন কথা বা শব্দ নেই যাতে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম এর বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত হন। এই 'ইশারাতুন্ নাস্' তথা ঐশীভাষ্যমূলক ইঙ্গিত দ্বারাও হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যু প্রমাণিত হচ্ছে। মৃত্যুর এই পশ্চাৎধাবন দ্বারা কালক্রমের প্রভাব-প্রতিফলন, শারীরিক দুর্বৈল্য, বার্ধিক্য ও রোগ-ব্যধি এবং বিপদাপদকে বুঝায় যা মৃত্যু ঘটানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এথেকে কোন সৃষ্টজীব মুক্ত নয়, এর ঊর্ধে নয়।

(২৯) উনত্রিশতম আয়াত: "মা আতাকুমুর-রাসূলু ফাখুযূহু ওয়া না মাহাকুম্ আন্‌হু ফান্‌তাহু" (সূরা আল্-হাশর)। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশনা ও জ্ঞানতত্ত্ব তোমাদের দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও।" অতএব এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের যে নির্দেশনা দান করেছেন, আসুন আমরা সেদিকে মনোযোগী হই। অতএব সেই হাদীস শ্রবণ করুন যা মিশকাতে আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে: **"ওয়া আনহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'মারু উম্মতি মা বাইনাস্ সিত্তিনি ইলাস্ সাবয়ীনা ওয়া আকাল্লুহুম মান ইয়াজুযু যালিকা ওয়ারা হুত্ তিরমিযি ওয়া ইব্‌নু মাজাহ্।"** 'আমার উম্মতের অধিকাংশ লোকের বয়স ষাট থেকে সত্তরের মাঝামাঝি হবে। এ বয়োসসীমা অতিক্রমকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হবে।' এটা স্পষ্ট যে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম এ উম্মতেরই একজন বলে গণ্য হয়েছেন। তাই বলে এত পার্থক্য কী করে সম্ভব যে অন্যদের বয়স মুশকিলে সত্তরে পৌঁছায় আর হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থা এমন হবে যে তাঁর বয়স প্রায় দু'হাজার বছর অতিবাহিত হলেও মৃত্যুবরণ করবেন না! বরং বর্ণনা করা হয় যে দুনিয়াতে ফিরে এসে তিনি (আরও) চল্লিশ বা পাঁচচল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন!!

অতঃপর দ্বিতীয় হাদীসটি 'সহীহ্ মুসলিমে' সংকলিত, যা হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন: **আন জাবরিন ক্বালা সামি'তুন্ নবীয়া সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম ইয়াকূলু ক্বাবলা আনঁ ইয়ামুতা বিশহ্‌রিন**

তাস্‌য়ালুনি আনিস্‌ সাআতি ওয়া ইন্নামা ইল্‌মুহা ইন্‌দাল্লাহ্‌ ওয়া উকুসিমু বিল্লাহি মা আলাল্‌ আরযি মিন্‌ নাফ্‌সিন মনফুসাতিন ইয়া'তি আলাইহা মিয়াতু সানাহ্‌ ওয়া হিয়া হাইয়াতুন রাওয়াহু মুস্‌লিমুন।' অর্থ: জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে শুনেছেন, 'ভূপৃষ্ঠে সৃষ্ট এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার বয়স একশ' বছর হয়ে যাবার পরও সে জীবিত থাকবে।' এ হাদীসটির অর্থ হল, পৃথিবীতে জন্মেছে এমন কোন ব্যক্তি একশ' বছর অতিবাহিত হবার পর জীবিত থাকবে না। আর পৃথিবীর কথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে, আকাশে সৃষ্ট লোকদের যেন এথেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়ম আকাশে সৃষ্টদের কেউ নন, বরং তিনি পৃথিবীতে সৃষ্ট এবং ভূপৃষ্ঠে মওজুদগণের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসটির অর্থ এমন নয় যে, জড়দেহবিশিষ্ট কেউ যদি ভূপৃষ্ঠে থাকে তাহলে সে মারা যাবে, আর সে যদি আকাশে উঠে যায় তাহলে মারা যাবে না। কেননা জড়দেহবিশিষ্ট কারও বসবাসের জন্য আকাশে উঠে যাওয়া স্বয়ং পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের পরপন্থী। বরং হাদীসটির অর্থ হল, যা ভূমি থেকে জন্মেছে ও ভূমি থেকে নির্গত হয়েছে তা কোনো ভাবেই (হাদীসটিতে উল্লেখিত) একশ' বছরের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না।

(৩০) ত্রিশতম আয়াত: "আও তারক্বা ফিস-সামায়ি.....কুল্‌ সুবহানা রাব্বি হাল্‌ কুন্‌তু ইল্লা বাশরার্‌-রাসূলা" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪)। অর্থাৎ, অস্বীকারকারীরা বলে, 'তুমি আকাশে ওঠে আমাদের দেখাও। তবেই আমরা ঈমান আনবো।' তুমি তাদের বলে দাও, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক (এসব থেকে) পবিত্র। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানব-রসূল।' এ আয়াতটি থেকে স্পষ্টত এই পরীক্ষাগারস্বরূপ পৃথিবীতে এরকম খোলা-খোলাভাবে নিদর্শন দেখানো আমার পবিত্রতার পরিপন্থী। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানবরসূল।' এ আয়াতটিতে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, কাফিররা রসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর কাছে আকাশে উত্থিত হওয়ার নিদর্শন দেখানোর দাবী জানিয়েছিল। তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় এ জবাব দেওয়া হয় যে, আকাশে উঠানো আল্লাহ্‌ তা'লার রীতি নয়। জড়দেহসহ ইব্‌নে-মরিয়মকে আকাশে উঠানো সঠিক বলে যদি স্বীকার করা হয় তাহলে উল্লিখিত এই জবাব অত্যন্ত আপত্তি জনক প্রতিপন্ন হবে এবং আল্লাহ্‌ পাকের কালামে স্ববিরোধিতা সাব্যস্ত হবে। অতএব সত্য ও নিশ্চিত ঘটনা এটাই যে, হযরত মসীহ্‌ (আ.) জড়দেহে আকাশে যান নি, বরং তিনি মৃত্যু বরণের পর আকাশে উত্থিত হন। ভাল কথা, আমরা ইনাদের জিজ্ঞেস করি; হযরত ইয়াহ্‌ইয়া, হযরত আদম, হযরত ইদ্রিস, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইউসুফ প্রমুখ (আলাইহিমুস্‌-সালাম) কি আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন, কি হন নি? যদি তাদের উঠানো না হয়ে থাকে, তাহলে মি'রাজের রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি করে তাদের সবাইকে আকাশে (অবস্থিত) দেখলেন? আর তাঁদের যদি 'রাফাঅ' অর্থাৎ উঠানো হয়ে থাকে, তাহলে অযথা কেন হযরত মসীহ্‌ (আ.)-এর 'রাফাঅ' অর্থাৎ উত্থিত হওয়ার অর্থ অন্য রকম করা হয়? আশ্চর্যের বিষয় যে, 'তওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ যে মৃত্যু তা বিশদভাবে প্রমাণিত। তাঁর স্বপক্ষে এ অর্থটি কুরআন করীম জুড়ে বিশদভাবে বিদ্যমান। তাঁর রাফাঅ্‌ তথা উত্থিত হওয়ার বিশদ নমুনা ও দৃষ্টান্তও দৃশ্যমান। কেননা তিনি সকল মৃত্যুবরণকারীদের মাঝে তাঁদেরই সাথে মিলিত হলেন যাঁরা তাঁর পূর্বে উত্থিত হয়েছিলেন, যদি বলেন যে, (পরলোকগত) ঐ সকল নবী উত্থিত (বা 'রাফাঅ') হন নি। তাহলে আমি বলি যে, তারা (মারা যাবার পর) কী করে আকাশে পৌঁছুলেন? তোমরা কি কুরআন করীমে এ আয়াত পাঠ কর না: **"ওয়া রাফা'নাহু মাকানান আলিইয়া"** (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইদ্রিসকে 'রাফাঅ' দান করেন তথা উচ্চ-পদমর্যাদায় উন্নীত করেন) এটি কি সেই 'রাফাঅ' নয়– যা হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে? উল্লিখিত এই **'রাফাঅ'**র অর্থ কি উত্থিত নয়? **'ফা-আন্না তুসরাফুন'** (অর্থাৎ তোমাদের কোন্‌ দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে? (চলবে)

ভাষান্তর:

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অবঃ)

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

লণ্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২২ আগষ্ট ২০১৮, মোতাবেক ২২ যহুর, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র

ঈদুল আযহার খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থ: তাদের মাংস ও তাদের রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না। বরং তার নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া পৌঁছে। এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরা আল হজ্জ: ৩৮)

আজ ঈদুল আযহা। সেই ঈদ যাকে কুরবানীর ঈদও বলে থাকে। আজকের দিন মুসলমান বিশ্বে অসংখ্য পশু কুরবানী করা হয়ে থাকে। হজ্জের সময় এত বেশি সংখ্যায় পশু যবাই করা হয়ে থাকে যে, সৌদি সরকারকে অন্য কোন কোম্পানির কাছে ঠিকা দিতে হয়। এরপরও এগুলো সামলানো কষ্ট হয়ে যায়, যদিও গরীব দেশগুলোতে এরা কুরবানীর মাংস প্রেরণ করে। যাহোক এ কুরবানী একটি বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একটি তুচ্ছ বস্তুকে উত্তম বস্তুর জন্য কুরবানী করা এবং এই অনুভূতি সৃষ্টির জন্য যে, মানুষ একটি তুচ্ছ বস্তুকে নিজের জন্য কুরবানী করতে পারে। সুতরাং যেহেতু মানুষ একটি পশুকে নিজের জন্য কুরবানী করতে পারে। তাই মানুষেরও ভাবা উচিত যে, সে উৎকৃষ্ট বস্তুর জন্য এবং সর্বোত্তম উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে কুরবানী করে দিবে। এটি স্বীকার করে যে, আমিও উন্নত বস্তুর জন্য নিজেকে কুরবানী করতে প্রস্তুত। আর এক মুমিনের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু

যার জন্য তাকে সব ধরণের কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকা উচিত তা হল, খোদা তা'লার সত্তা। খোদা তা'লার আদেশ নিষেধের উপর আমল করার জন্য সব ধরণের কুরবানীর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করা, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা, প্রাণ-সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করতে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রস্তুত থাকা আর এটিই হল তাকওয়া। আর এটিই সেই উদ্দেশ্য প্রতি বছর যার অনুভূতি সতেজ করতে ঈদুল আযহা পালন করা হয় আর তা হল, নিজের এই কুরবানীর উদ্দেশ্যকে ভুলে না যাওয়া। ঈদুল আযহায় কুরবানী এবং ঈদের খুশি শুধুমাত্র এজন্য নয় যে, আমরা মাংস খাব এবং নিজেদের পরিবারের সাথে ঈদের খুশি বন্টন করব। বরং এ জন্য যে, আমরা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি ও তার আদেশ-নিষেধের উপর আমল করার জন্য সব ধরণের কুরবানী করতে প্রস্তুত। আর এই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'লা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। কুরবানীর প্রজ্ঞা এটি নয় যে, এর মাংস কিংবা রক্ত আল্লাহ তা'লার কাছে পৌঁছায়। বরং প্রকৃত প্রজ্ঞা হল,সব ধরণের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করে এই কুরবানী তোমাদের তাকওয়ার পথে উন্নতি দান করবে। এবং সব ধরণের কুরবানীতে তোমরা উন্নতি কর। আর যখন তাকওয়ায় উন্নতি হবে, তখন এটিই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হবে যে, তার বান্দা নিজের নফসের কুরবানী করে আল্লাহর অধিকারও আদায় করে এবং বান্দার অধিকারও আদায় করে। বর্তমানে যুগে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি এই বিষয়টি অনুধাবন করা জরুরী যে, আমরা নিজেদের নফসের কুরবানী করে উপরোক্ত দুই ধরণের অধিকার আদায় করব। যখন আমরা পার্থিব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেই, তখন দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে বেশি এই চিত্র দেখা যায় যে, তারা তাকওয়া থেকে দূরে সরে গেছে। অন্যদের কাছ থেকে কুরবানী নেয়ার জন্য জোরে সোরে দাবি করে বসে, কিন্তু নিজের প্রতি দৃষ্টি দেয় না, নিজের অবস্থার দিকে তাকায় না, নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করে না। কিছু লোক তো যুলুম ও অত্যাচারের এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে যা শুনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বে ইয়ামেনের স্কুলে যেভাবে শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে অথবা স্কুল বাসে বোমা রেখে ডজন ডজন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, নির্দয় এবং নির্মমভাবে মুসলমান মুসলমানের রক্ত বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, এ সবকিছু তাকওয়ার ঘাটতি। হজ্বে যায়, আল্লাহ তা'লার আদেশ নিষেধের উপর আমল করার ঘোষণাও দেয়, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক ধ্বনির উচ্চারণও করে, পশু কুরবানীও করে আর একইভাবে হজ্জ ছাড়াও যেরুপটি আমি বলেছি বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বসবাসকারীরা সামর্থানুযায়ী কুরবানী করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'লার এই ঘোষণার প্রতি চিন্তা করে না যে,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, স্বরণ রেখ! তাদের মাংস ও তাদের রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না। বরং তার নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া পৌঁছে। সুতরাং যদি এই হজ্জ এবং কুরবানী এবং এই ঈদের খুশি তাকওয়া সৃষ্টি না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসবের দুই পয়সারও মূল্য রাখে না, বিন্দুমাত্রও মূল্য রাখে না। যেসব শিশুদেরকে কিছুদিন পূর্বে হত্যা করা হয়েছে এবং স্বাধীনচেতারা- যেমনটি আমি বলেছি, কলেমা পাঠকারী কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করছে, তারা কি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে পারবে? আল্লাহ তা'লা বলেন যে, না। যে হৃদয় তাকওয়াশুন্য সে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য পেতে পারে না এবং যে এই কুরবানীসমূহের যথার্থতা অনুধাবন করে আল্লাহ তা'লার আদেশ নিষেধকে সামনে রেখে বান্দার অধিকার আদায় করবে, খোদা তা'লার হুকুম-আহকাম পালন করবে এবং তার অধিকার আদায় করবে সে বড় বড় পুরস্কার লাভ করবে।

বর্তমানে আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ,) কে মেনে আমরা সেই বিশৃংখলাপূর্ণ এবং যুলুম ও অত্যাচারে নিমজ্জিত দুনিয়া থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হইনি। মুসলিম দেশগুলোও আর অমুসলিম দেশগুলোও এ ধরণের অরাজগতায় লিপ্ত। সেই সমস্ত দেশগুলোর সংখ্যা অনেক রয়েছে আর এর কারণও স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'লার প্রেরিত প্রতিনিধিকে কবুল করতে তারা প্রস্তুত নয়। নফসের উপর পার্থিব কামনা বাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে এবং নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে বসে তাকওয়া থেকে দুরে সরে গেছে। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে আমাদের আহমদীদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। আর তা হল, নিজেদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি নিজেদের সন্তান সন্ততিকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়া করুন। একইসাথে বিশ্বকে আল্লাহ তা'লার পাকড়াও থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন। এটি কোন সাধারণ কাজ নয়। এ কাজ ধারাবাহিক কুরবানী এবং চেষ্টা প্রচেষ্টার দাবি রাখে। আর এর জন্য যেরুপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলোকে সর্বদা সামনে রাখা উচিত। নিজেদের অবস্থার দৃঢ়ভাবে পুনঃনিরীক্ষণ করা আবশ্যক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে এ ব্যপারে কি চান? আর তা হল, তা যেন আমরা সামনে রাখি। আর বার বার যেন এটি স্বরণ করতে থাকি। তাহলেই আমরা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারব। তাহলেই আমরা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। নতুবা আমরা মসীহ মওউদ (আ.) কে মানার দাবি করা সত্ত্বেও সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা কেবলমাত্র বাহ্যিক কুরবানী করে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ,) আমাদেরকে কিরুপে তাকওয়া অর্জনের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন? আর কি মান তিনি দেখতে চেয়েছেন যা আমাদের অর্জন করতে হবে? এ ব্যপারে তার (আ.) কিছু উদ্বৃতি আমি নিয়েছি।

তিনি (আ.) বলেন, "হৃদয়ের পবিত্রতা হল প্রকৃত কুরবানী। হৃদয়ের পবিত্রতা হল

প্রকৃত কুরবানী। মাংস এবং রক্তকে প্রকৃত কুরবানী বলে না। যেরুপভাবে সাধারণ মানুষ পশু কুরবানী করে থাকে এবং বিশেষ ব্যক্তিরা হৃদয়ের কুরবানী করে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা এ ধরণের কুরবানীও বন্ধ করেননি, অর্থাৎ বাহ্যিক কুরবানী বন্ধ করেন নি যেন বুঝা যায় যে, এই সমস্ত কুরবানীরও মানুষের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং প্রকৃত কুরবানী হৃদয়কে যবাই করা, নিজ নফসকে হত্যা করা। হৃদয়কে যবাই করা বলতে কি বুঝায়? এটি আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের কামনা বাসনা পরিত্যাগ করা, স্বীয় নফসকে হত্যা করা এবং ঈমানের উন্নত মান অর্জন করা।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অন্য এক স্থানে বলেছেন, "নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ! প্রত্যেক পবিত্রতা এবং পুণ্যের প্রকৃত মূল হল খোদার উপর ঈমান আনা। প্রত্যেক পবিত্রতা এবং পুণ্যের প্রকৃত মূল হল খোদার উপর ঈমান আনা। মানুষের আল্লাহর প্রতি ঈমান যতটুকু কমে যায়, সৎকর্মে ততটুকুই দুর্বলতা ও অলসতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ঈমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহ তা'লাকে তার সকল গুণাবলীসহ বিশ্বাস করা হয়, ঠিক ততটা আশ্চর্যজনক পরিবর্তন মানুষের আমলে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী পাপকাজে লিপ্ত হতে পারে না। যার আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রয়েছে তার মাধ্যমে পাপকাজ হতে পারে না। জেনে বুঝে পাপ করবে না। কেননা এই বিশ্বাস তার নফসের শক্তিগুলোকে এবং পাপের শাখা প্রশাখাকে কর্তন করে। শাখা প্রশাখা কর্তন করার অর্থ এটি নয় যে, সে ব্যবহারিকভাবে প্রত্যেক সেই শাখাকে কর্তন করে যার মাধ্যমে পাপ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। না, বরং তার তাকওয়ার মান এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের মান এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে সে তার প্রতিটি ব্যবহারিক কর্মকে খোদা তা'লার আদেশ নিষেধের অনুসারী করতে চেষ্টা করে এবং এটিই হৃদয় যবাই করার অর্থ। এটিই নফসকে হত্যা করা।" আর এ বিষয়ে আমাদের উপর ভরসা রেখে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামাতের পরিপূর্ণ ঈমান প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "সুতরাং আমাদের জামাতের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার উপর প্রকৃত ঈমান অর্জন করে।"

মানুষ যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপরোক্ত বাক্যাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তখন কেঁপে উঠে যে, আমরা কি তাকওয়ার এই মান এবং ঈমানের এই মান অর্জন করতে চেষ্টা করছি? বর্তমান যুগের এই বিশ্বে প্রতিটি পদেক্ষেপে শয়তান তার সমস্ত চিত্তাকর্ষকতা, ইন্ধন ও নির্লজ্জতার উপকরণসমূহ দ্বারা ওঁৎ পেতে বসে আছে আর এই অপেক্ষায় আছে যে, সে মুমিনের উপর আক্রমণ করবে, বরং উপর্যুপুরি আক্রমন করে যাচ্ছে। এমন সময় ঈমানের উন্নত মানই মানুষকে বাচাতে পারে, যার উল্লেখ হযরত মসীহ মওউদ (আ,) করেছেন। পার্থিবতার অস্থায়ী বিষয়াবলীকে কুরবানী করে, পার্থিব সময় এবং অস্থায়ী কামনা বাসনাকে কুরবানী করেই আমরা আল্লাহ তা'লার সামনে মস্তক অবনত করে তার সাহায্য প্রার্থনা করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

সুতরাং আজ আমাদেরকে এই কুরবানীর ঈদ নিজেদের নফসের কুরবানীর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধকারী হওয়া উচিত যার ব্যপারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নফসের কুরবানী এবং পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করে থাকে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন, "ভয় এবং ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শনের মূল হল পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তার প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ তা'লাকে সত্যিকার অর্থে চেনা, এটিই পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাকে ভয় এবং পরিপূর্ণ ভালবাসা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যে আল্লাহ তা'লার পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান পেয়ে যাবে সে আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং ভালবাসার উন্নত মান অর্জন করে ফেলে অথবা এটি বলতে পারি যে, তার তাকওয়ার মান উচু হয়ে যায়।" তিনি বলেন, আর যাকে ভয় এবং পরিপূর্ণ ভালবাসা প্রদান করা হয়েছে প্রত্যেক পাপ থেকে যা অজান্তে সংঘটিত হয়ে যায় মুক্তি দেয়া হয়েছে।

কিছু পাপ সংঘটিত হয় মানুষের নিজেদের সাধারণ কিছু ভুলের কারণে, অজ্ঞতার কারণে অথবা কতক পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু যখন মানুষ এমন পাপ যা অজান্তে করতে থাকে এবং সেগুলোর ভ্রুক্ষেপ করে না। তিনি (আ,) বলেন, যে পরিপূর্ণ ভালবাসা লাভ করেছে, প্রত্যেক সে সকল পাপ যা অজান্তে ঘটে যায়– মানুষের সজ্ঞানবশত পাপের বিপরীতে সে মুক্তি লাভ করে। তিনি (আ.) বলেন, "আমরা এই মুক্তির জন্য কোন রক্তের মুখাপেক্ষি নই আর না ক্রুশের মুখাপেক্ষি। আর কোন কাফফারারও আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু একটি কুরবানীর মুখাপেক্ষি আর তা হল, নিজের প্রবৃত্তির কুরবানী যার প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতি অনুভব করছে। অন্য কথায় এমন কুরবানীর নাম হল, ইসলাম। সুতরাং প্রবৃত্তির কুরবানী পাপ থেকে বাচার এবং তাকওয়ার উন্নতির নাম হল, ইসলাম। তিনি বলেন, ইসলামের অর্থ হল, যবাই হওয়ার জন্য গর্দানকে সামনে বাড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে নিজের আত্মাকে খোদা তা'লার আস্তানায় সমর্পণ করা। তিনি বলেন, এ সুন্দর নাম সমস্ত শরীয়তের রুহ এবং সমস্ত আদেশ নিষেধের প্রাণ। যবাই হওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ের প্রশান্তি ও সন্তুষ্টিতে গর্দান সামনে উপস্থাপন করা পরিপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসা চায় এবং পরিপূর্ণ ভালবাসা পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানকে চায়। সুতরাং ইসলাম শব্দটি এ কথাটির দিকেই ইঙ্গিত করে যে, পরিপূর্ণ কুরবানীর জন্য পরিপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসার প্রয়োজন। এছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন নাই। এ বিষয়টির দিকে আল্লাহ তা'লা কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের কুরবানীর না মাংস আমার কাছে পৌছাতে পারে, না রক্ত। বরং কেবলমাত্র এই কুরবানী আমার কাছে পৌঁছে যে, তুমি আমাকে ভয় কর এবং আমার জন্য তাকওয়া অবলম্বন কর।

ইসলামের রুহকে কিভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং তাকওয়ার মানদণ্ড কি

হওয়া উচিত তা আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, "খোদা তা'লা ইসলামে শরীয়তের মাঝে অনেকগুলো জরুরী নির্দেশের জন্য উদাহরণ দাড় করিয়েছেন। সুতরাং মানুষের জন্য এই আদেশ রয়েছে যে, সে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে খোদার পথে কুরবানী হবে। সুতরাং বাহ্যিক কুরবানীসমূহকে ঐ অবস্থার উদাহরণ বানানো হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এই কুরবানী যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, খোদার কাছে তোমাদের কুরবানীর মাংস পৌছায় না আর না রক্ত পৌছায়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তার কাছে পৌছায়। সুতরাং তাকে অর্থাৎ আল্লাহকে এত্‌টা ভয় কর যেন তার পথে তুমি মরেই যাবে। যেভাবে তুমি নিজের হাত দ্বারা কুরবানীর পশু যবাই কর, সেভাবে তুমিও খোদার পথে যবাই হয়ে যাও। যখন কোন তাকওয়া এই মানের কম হয় তাহলে তা এখনও ত্রুটিপূর্ণ।

সুতরাং এটি সেই মানদন্ড যা তিনি (আ.) আমাদের কাছে আশা করেন। আর এই মানদণ্ড তখনই অর্জন হতে পারে যখন আল্লাহর অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করা হবে এবং বান্দার অধিকারও আদায় কারা হবে। সমস্ত আদেশ নিষেধ নিজের সর্বোচ্চ শক্তি সামর্থ দিয়ে আদায়কারী হবে এবং সেসবের উপর আমলকারীও হবে। সুতরাং এটি সেই বিষয় যা তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জনকারী বানায় এবং মুমিনকে পূর্ণ ঈমানদার বানায়। যার ফলাফলস্বরুপ পরবর্তীতে খোদা লাভ হয়। ইবাদতের বাহ্যিক চিত্রের রুহ এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এর কেমন প্রভাব পড়া উচিত আমাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ,) বলেন, "বাহ্যিক নামায এবং রোযা নিজের মাঝে কোন সৌন্দর্য্য রাখে না। যদি না এর মাঝে সততা ও নিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে। যোগী ও সন্নাসীরাও নিজের স্থানে চেষ্টা সাধনা করে আর অনেক সময় দেখা যায় যে, তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক নিজের হাত শুকিয়ে ফেলে। কেউ হাত উচু করেছে তো বেশ কয়েকদিন উচুতেই রেখেছে। এমনকি তার রক্তসঞ্চালনও বন্ধ হয়ে হাত শুকিয়ে গেছে। এত পরিমাণ তারা সাধনা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজেকে দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ফেলে দেয়। কিন্তু তারা কোন জ্যোতি লাভ করে না আর না কোন ধরণের তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। একটি বাহ্যিক বিষয় যা তারা করেছে কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তারা শারীরীক ব্যায়াম বা সাধনার পরে যা হৃদয়ের সাথে দুর্বল সম্পর্ক রাখে, বাহ্যিকভাবে শরীরের ব্যয়াম তো হয়ে গেছে কিন্তু নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং নিজের হাতও শুকিয়ে ফেলেছে, নিজেদের বাহুদ্বয়ও শুকিয়ে ফেলেছে, নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অথচ এসবের সাথে হৃদয়ের বা অভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন সম্পর্ক হয় না। আত্মার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিকতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, অন্য কোন প্রভাব তার আত্মার উপর পড়ে না। এই বিষয়কে এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে এভাবে বলেছেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার কাছে তোমাদের কুরবানী মাংস ও রক্ত পৌছায় না, বরং তাকওয়া পৌঁছায়। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ খোসা পছন্দ করেন না, তিনি মজ্জা চান।

তিনি (আ.) বলেন, এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যদি মাংস ও রক্ত না পৌঁছে, বরং তাকওয়া পৌঁছে তাহলে কুরবানী করার কি প্রয়োজন? এবং একইভাবে যদি নামায, রোযা আত্মার বিষয় হয় তাহলে আমরা যে বাহ্যিক অনুশীলন করি এবং নামাযে বিভিন্ন অবস্থান হয়ে থাকে, এর প্রয়োজন কি? তিনি বলেন, এর উত্তর এটাই যে, এটি একেবারে সঠিক কথা যে, যেসব লোক দৈহিক সেবা করা ছেড়ে দেয় তাকে রূহ গ্রহণ করে না এবং এতে সেই প্রার্থনা ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে পারে না যা কিনা প্রকৃত উদ্দেশ্য। দেহের সেবা করাও জরুরী আত্মার গ্রহণীয়তা জন্য, আত্মাকে এ দিকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি বলেন, যে কেবলমাত্র দেহ দ্বরা কাজ নেয় আত্মাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে না সে ভয়ানক ভুলের মধ্যে নিপতিত। আর এই যোগী বা সন্নাসী সেই ধরণের যারা শুধু বাহ্যিকভাবে দৈহিক সাধনা করে থাকে অথবা নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় অথবা চেষ্টা প্রচেষ্টা করে।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা দেহ এবং আত্মার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক রেখেছেন। দেহের প্রভাব আত্মার উপর পড়ে। দেহ এবং আত্মা দুটি পরস্পর সমান্তরালে চলে। নামাযে আমরা হাত বেধে দাড়াই, রুকু করি, হাত ছেড়ে দাঁড়াই আবার সেজদায় চলে যাই। এসব আমল বা অনুশীলন দেহের বাহ্যিক বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ যার দ্বারা আত্মায়ও তেমনি পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, যেভাবে মানুষের বাহ্যিক বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, সেগুলো নামাযে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আত্মার যখন বিনয় সৃষ্টি হয় তখন দেহেও বিনয় সৃষ্টি হয়। এজন্য যখন আত্মায় প্রকৃতপক্ষে বিনয় এবং নম্রতা থাকে তখন দেহে এর প্রভাব আপনাআপনি প্রকাশ পায়। সেজদাবনত অবস্থায় মানুষের মাঝে এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। চরম বিনয়ের অবস্থা হৃদয়ের উপরও এর প্রভাব পড়ে থাকে। তিনি বলেন, দেহের মাঝে এর প্রভাব আপনাআপনি প্রকাশ পায় এবং এভাবেই দেহের উপর এক অন্য রকম প্রভাব পড়ে, তখন আত্মাও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে থাকে আর এটিই নামাযের বিভিন্ন অবস্থার দর্শন।

অতঃপর তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমকে যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তাকওয়ার ময়দান খালি। যে উদ্দেশ্যে আমি এসেছি সে উদ্দেশ্য এটিই যে, তাকওয়ার ময়দান খালি হয়ে গেছে। তাকওয়া দুনিয়া হতে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তাকওয়ার ময়দান খালি পড়ে আছে। তাকওয়া থাকা উচিত। এটি নয় যে, তরবারী ধারণ কর। এটি হারাম। যদি তোমরা তাকওয়াশীল হও তাহলে সমস্ত দুনিয়া তোমাদের পক্ষে

হয়ে যাবে। সুতরাং তাকওয়া সৃষ্টি কর। যেসব লোক মদপান করে, যাদের ধর্মের চিহ্নসমূহে মদ সম্পৃক্ত তাদের তাকওয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হতে পারে তারা পুণ্যের সাথে যুদ্ধ করছে। সুতরাং আল্লাহ তা'লা যদি আমাদের জামাতকে এমন সৌভাগ্য দেয় এবং তাদেরকে এই তৌফিক দান করে যে, তারা গুনাহর সাথে লড়াকু হয় এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার ময়দানে উন্নতি করে। তিনি বলেন, এটি বড় সফলতা হবে এবং এর থেকে বড় কোন বিষয় অর্জিত হতে পারে না। তিনি বলেন, এখন সমস্ত দুনিয়ার ধর্মসমূহ পর্যবেক্ষণ কর। আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া, সেটাই অনুপস্থিত। আর দুনিয়ার কারণসমূহকে খোদা বানানো হচ্ছে। আসল খোদা লুকিয়ে গেছে এবং সত্য খোদার অবমাননা করা হচ্ছে। কিন্তু খোদা এখন চান যে, এখন তাকে মান্য করা হোকএবং দুনিয়া অবগত হোক যে, সব লোক দুনিয়াকে খোদা মনে করে সে খোদার উপর সমর্পনশীল হতে পারে না।

সুতরাং মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর বয়াত আমাদের উপর অনেক বড় এক দায়িত্ব অর্পন করেছে যে, নিজের মাঝে প্রকৃত সৃষ্টি করুন। এটি কুরবানী ছাড়া হতে পারে না। মুত্তাকী কে? এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, "খোদার কালাম থেকে জানা যায় মুত্তাকী সে, যে সহিষ্ণু ও মিসকিনি অবস্থায় জীবনযাপন করে। সে অহংকারমূলক কথাবার্তা বলে না। তাদের কথা এমন হয় যে, ছোট বড় মানুষের সাথে কথা বলছে। অনেক বিনয় হয়ে থাকে তাদের মাঝে। তিনি বলেন, আমাদের সর্বাবস্থায় এমন হওয়া উচিত যাতে আমাদের বিজয় হয়। আল্লাহ তা'লা কারো ইজারাদার নন। তিনি বিশেষ তাকওয়া চান, যে তাকওয়া অর্জন করবে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। তিনি বলেন, মহানবী সা অথবা হযরত ইবরাহীম আ এ দুই জনের মাঝে কেউই উত্তরাধিকারসূত্রে সম্মান লাভ করেননি। যদিও আমাদের বিশ্বাস যে, তার সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি তো নবুয়্যতও দেননি। কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে এটি লাভ করেনি। বিশেষ করে মহানবী সা কে বলেছেন, আপনার সম্মানিত পিতা যদিও তিনি মুশরিক ছিলেন না, কিন্তু এই কারণে আপনি নবুয়্যত লাভ করেননি। এটি তো আল্লাহর ফযল ছিল সেসব সদকার কারণে যেগুলো তার প্রকৃতিতে ছিল। সেই সত্যতা যা তার সা স্বভাবে ছিল এসবের কারণে তার উপর আল্লাহর ফযল হয়েছে। এই ফযলেরই প্রভাবক ছিলেন ইবরাহীম (আ.) যিনি নবীদের পিতা। তিনি নিজে সততা ও তাকওয়ার কারণেই নিজের ছেলেকে কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি আ বলেন, আমার নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ সা এর সততা ও পবিত্রতা দেখুন যে, তিনি প্রত্যেক প্রকার মন্দ তাহরীকের মোকাবেলা করেছেন। বিভিন্ন ধরণের কষ্ট ও বিপদ সহ্য করেছেন। কিন্তু সামান্য ভ্রুক্ষেপও করেননি। এই সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল যার কারণে আল্লাহ তা'লা ফযল করেছেন। তাই আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা এবং তার সমস্ত ফেরেশতা নবী করীম সা এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! এই নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব ৫৭)

তিনি বলেন, এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রসূলে করীম সা এর আমল এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'লা তার প্রশংসা কিংবা গুণাবলির সীমা নির্ধারণের জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি বলেন, শব্দ তো পাওয়া যেত, কিন্তু নিজে ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ, তার সৎকর্মের প্রশংসা সীমার উর্দ্ধে ছিল। এ ধরণের আয়াত অন্য কোন নবীর মর্যাদায় ব্যবহৃত হয় নি। অর্থাৎ, এর বা সৎকর্মের প্রশংসা করা সীমাতিত ছিল। অর্থাৎ এমন উচ্চ এবং পরিপূর্ণ আমল ছিল যার কোন সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে না। অথবা যা সাধারণ মানুষ অবলম্বন করতে পারে না। তিনি বলেন, এ ধরণের আয়াত অন্য কোন নবীর মর্যাদায় ব্যবহৃত হয়নি। তিনি বলেন, তার সা রুহে সেই সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল আর তার আমল খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ তা'লা চিরকালের জন্য আদেশ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতাস্বরুপ তার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে। তার সাহস এবং সততা ও বিশ্বস্ততা যা ছিল যদি আমরা অদ্যাপন্ত সেদিকে দৃষ্টি দেই তাহলে এর কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

তিনি (আ.) বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দেখেন তারঁ সাহস বা আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা প্রভাব তারঁ অনুসারিদের ওপর পড়েছে। প্রত্যেকে জানে একজন অসভ্যকে ভাল করা কতটুকু কঠিন। যে অভ্যাস স্থায়ী হয়ে যায় তা বর্জন করানো কতটুকু কষ্টের কাজ কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাজার হাজার মানুষকে সভ্য করেছেন যারা পশু থেকেও মন্দ ছিল। অনেকে পশুর মত মা-বোনের মাঝে কোন পার্থক্য করত না। এতিমের সম্পদ আত্মস্যাৎ করত, মৃত ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করত। অনেকে নক্ষত্র পূজারী, অনেকে নাস্তিক, অনেকে বস্তু পূজারী ছিল। আরব ভূখণ্ড কি ছিল? একটি সমন্বিত ধর্ম নিজেদের মাঝে ধারণ করত কিন্তু যখন আল্লাহ তা'লা তিনি (সা.) কে প্রেরণ করলেন তখন তিনি সবার সংশোধন করে দিলেন। অতএব আমাদের সামনে তিনি (সা.) সর্বোত্তম আদর্শও প্রতিষ্ঠিতও করে দিলেন আর এটিই সেই আদর্শ যা একজন মোমেনের ঈমানে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য অনুসরন করা আবশ্যক। তিনি (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, আমাদেরকে নিজেদের জীবন বিনয় ও নম্রতার সাথে অতিবাহিত করার ও নিজের আমল আল্লাহ তা'লা আদেশ অনুসারে করার এবং সত্যিকার তাকওয়া সৃষ্টি করার কতটুকু দরকার। তিনি বলেন, মুত্তাকীর জন্য শর্ত হলো সে যেন তার জীবন দীনতা ও মিসকীন অবস্থায় অতিবাহিত করে, এটি তাকওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। তাকওয়া কি ? দারিদ্রতা বলতে এটি নয় যে মানুষ

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বরং দারিদ্রতা হলো এটি যে মানুষ ধনী হওয়া সত্ত্বেও দীনতা ও মিসকীনের মত অবস্থা হবে এবং গরীবদের দেখাশোনা করবে এবং বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, এটি তাকওয়ার একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যায় ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। বড় বড় আল্লাহপ্রেমী এবং সিদ্দিকদের জন্য শেষ ও মজবুত ঠিকানা হলো ক্রোধ থেকে নিজেকে বিরত থাকা। অহংকার ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয় এবং এমনকি কখনো স্বয়ং ক্রোধ অহংকারের কারণ হয়ে যায় অথ্যাৎ ক্রোধের কারণে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হয়ে যায় কেননা রাগ ঐ সময় উঠবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রধান্য দিবে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি এটি চাই না আমার জামাতের সদস্য একজন আরেকজনকে ছোট বা বড় মনে করবে বা একজন আরেকজনের সাথে অহংকার করবে বা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখবে। কাউকে ছোট বা তুচ্ছ মনে করবে। তিনি আরো বলেন, খোদা জানেন বড় কে বা ছোট কে এটি এক ধরণের অবমাননা যার মাঝে অবজ্ঞা রয়েছে ভয় হয় এই অবজ্ঞা বীজের মত বৃদ্ধি পাবে এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। যদি এই অবজ্ঞা কারো মাঝে থাকে তবে সেটি বীজের মত হবে যেভাবে বীজ থেকে চারা বের হয় এবং বড় হয়ে যায় একইভাবে এটি মানুষের অন্তরে বড় হতে থাকে এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায় এবং তাকওয়া থেকে দূরে সরে যায় এবং আল্লাহ তা'লা থেকেও দূরে চলে যায়। এটি এক মোমেনের ধ্বংস। তিনি (আ.) বলেন , অনেক মানুষ বড় মাপের ব্যক্তির সাথে অনেক সম্মানের ব্যবহার করে কিন্তু বড় সে যে মিসকীনের কথা মিসকীনের মত শ্রবণ করে এবং তার মন:স্তুষ্টি করে এবং তার কথার সম্মান করে। কোন রাগসুলভ কথা মুখে আনবে না যাতে তার কষ্ট হয়। খোদা তা'লা বলেন, ওয়ালা তানাবাজু বিল আলক্বাব বি'সাল ইসমুল ফুসুকু বা'দাল ঈমান ওয়া মাললাম ইয়াতুব ফাউলাইকা হুমুজ জয়ালিমীন (আল হুজুরাত -১২) অর্থ্যাৎ আর নাম বিকৃত করে তোমারা একে অন্যকে উপহাস করো না। ঈমান আনার পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া অবশ্যই মন্দ। আর যারা অনুতাপ করে না তারাই দুষ্কৃতকারী।

তিনি (আ.) বলেছেন, তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবেনা এটি ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অসৎ লোকের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে বিকৃত নামে ডেকে কষ্ট দেয়, তার সাথে এক্ই আচরণ না করা পযন্ত সে মরবে না। নিজের ভাইকে ছোট মনে করবে না। একই প্রসবণ থেকে সবাই পানি পান কর কে জানে কার ভাগ্যে বেশী পানি পান রয়েছে। কেউ পৃথিবীর নিয়মে সম্মানিত হতে পারে না। খোদ তা'লা নিকট সম্মানিত সে যে মুত্তাকী। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতকাকুম ইন্নাল্লাহা আলীমুন খাবির। অথ্যাৎ আল্লাহর নিকট সম্মানিত তিনি যিনি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। তিনি অন্তরের তাকওয়াকেও জানেন কুরবানির নিয়্যতকেও জানেন। যদি নেক আমল না থাকে, অধিকার প্রদান করা না হয়, অন্তরে অহংকার থাকে, তবে এমন লোকদের কুরবানি কবুল হয় না। এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয় তাই সর্বদা আমাদেরকে যাচাই করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) এক স্থানে বলেন, বিশেষ করে আমাদের জামাতের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষভাব ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও যে, সে এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাঁর সিলসিলার বয়াতকারী যার মামুরিয়্যাতের দাবি রয়েছে যেন এ সমস্ত লোক যদিও তারা কোন ধরণের হিংসা বিদ্বেষ বা শিরকে লিপ্ত ছিল বা যতই দুনিয়াদার ছিল এ সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং যদি প্রত্যেক পাপ থেকে দূরে সরে তাকওয়াতে লিপ্ত হয়ে যায় তবে সমস্ত পাপ থেকে আল্লাহ তা'লা মুক্তি প্রদার করবেন যদি না সত্যিকার অর্থে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। আল্লাত তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার তাকওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমাদেরকে আত্মার সংশোধন ও আল্লাহ তা'লা কুরবানি করারও তৌফিক প্রদান করুন। আমাদের অন্তর প্রত্যেক ধরণের কলুষতা থেকে পবিত্র হোক। আমরা হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ প্রদানকারী সাব্যস্ত হই এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বয়াতের অধিকার প্রদানকারী হই। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকেও রক্ষা করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিই হলো আসল বিষয় যা আমাদের সত্যিকার ঈদের আনন্দ লাভ করার মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহ তা'লা করুন আমরা যেন সেই স্থান অর্জনকারী হই।

খুতবা সানিয়া পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

এখন আমরা দোয়া করব বিশেষভাবে দোয়াতে সমগ্র পৃথিবীর অত্যাচারিত আহমদীদেরকে স্মরন রাখুন যারা ধর্মের সুরক্ষার জন্য কুরবানি করছে , আপন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য কুরবানি করছে। পাকিস্থানে সবচেয়ে বেশী আহমদীদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। একইভাবে আলজাজিরাতেও আহমদীদের ওপর অনেক অত্যাচার করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা এই অত্যাচারকে তার বিশেষ ফযলের মাধ্যমে দূর করুন। বন্দিদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'লা তাড়াতাড়ি তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'লা তাদের কুরবানিকে কবুল করে অতিরিক্ত অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। যেসব দেশে আহমদীদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আল্লাহ তা'লা ঐ প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে দিন। পুরাতন আহমদী ও নতুন আহমদীদেরকে দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করতে থাকুন। আর্থিক কুরবানিকারীদের কুরবানিও কবুল করুন, মুবাল্লেগীন, মোয়াল্লেমীন যারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহ তা'লার ধর্মের প্রসারের জন্য কুরবানি করছেন। আল্লাত তা'লা তাদের কাজে বরকত দিন ও তা কবুল করুন। সমস্ত ওয়াকফে জিন্দেগী ও কর্মকর্তাদের জন্যও দোয়া করুন। তাদেরকে তাকওয়ার পথে চলে আল্লাহ তা'লার কাজ করার তৌফিক দান করুন ও তাদের সেবাকে গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা আমাদের ওপর তার দয়ার দৃষ্টিপাত করুন। এখন দোয়া করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধায়নে অনুদিত)

ঈদুল আযহার তাৎপর্য ও আমাদের করণীয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃপায় আর ক'দিন পরেই আমরা ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করব, ইনশাআল্লাহ। মুমিন বান্দার জীবনে কুরবানীর গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ মুমিনের জীবনের একমাত্র আরাধনা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আর প্রকৃত কুরবানী তাকে অত্যন্ত দ্রুত আল্লাহর নৈকট্যে ভূষিত করে। আমরা বাঙালী কুরবানীর ঈদ বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করি। কুরবানী শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই এ কুরবানী।

কুরবানীর ঈদ-পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর পশু কুরবানী করে থাকে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন' (সূরা কাউসার, আয়াত ৩)। কুরবানী একটি প্রতীকি ব্যাপার। এখানে পশু কুরবানীর মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জানমাল থেকে শুরু করে সবকিছুই কুরবানী করতে প্রস্তুত। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তার পুরো পরিবারের নজিরবিহীন কুরবানীর ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয় তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন তার সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এবং মা হাজেরার আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহি:প্রকাশগুলো আল্লাহ্ তা'লা হজের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে স্বপ্নে দেখালেন, তিনি তার পুত্রকে জবাহ করছেন (সূরা সাফ)। যেভাবে কুরবানী কবিতায় কবি নজরুল বলেছেন: এই দিনই মিনা ময়দানে, পুত্র-স্নেহের গর্দানে, ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে, রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ! ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন! আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন! ওরে হত্যা নয় আজ সত্যগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।' পিতা ইব্রাহিম স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গেলে আল্লাহ বললেন, আরে ইব্রাহিম, তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। আমি তোমাকে নিজ পুত্রকে আমার পথে উৎসগ করতে বলেছি, হত্যা করতে নয়। তোমার পুত্র সারাজীন লোকদেরকে বুঝাবে আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন দুম্বা বা ছাগল জবাই করলেন? এর উত্তর হলো: যদি সেদিন এই ঘটনা না ঘটতো তাহলে তৎকালীন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কোন কোন জাতিতে প্রভুকে বা দেব-দেবীদেরকে খুশি করার জন্য নরবলী তথা মানুষ কুরবানী চলমান থাকতো। অতএব আল্লাহ মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন, মানুষ জবাহ করার জিনিস নয়, জবাহ যদি করতে হয় তাহলে পশু জবাহ করো।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত রসুলে পাক (সা.) এর শ্রদ্ধেয় পিতা একবার অসুস্থ হলে তার দাদা একশত উট জবাহ করেছিলেন (সিরাতে নববী)। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পশু জবাই করা রসূল (সা.) প্রচলন করেন নি বরং পূর্বেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু জবাই করা হতো। পশু কুরবানীর আরো একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে মুসা (আ.) এর জাতিকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন, 'তোমরা যে গাভীকে পুজা করো, সে পুজনীয় নয় বরং আমি পুজনীয়, অতএব সেটাকে জবাহ করো' (সূরা আল বাকারা, রুকু ৮) গরু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা এর দুধ পান করতে পারো এবং গোশত খেতে পারো আর এর মাধ্যমে অন্যান্য উপকার সাধন করতে পারো। মুল উদ্দেশ্য হলো, হৃদয়েও যদি কোন পশু থাকে সেই পশুকে হত্যা করতে হবে, সেটাকে জবাই করতে হবে। হাদিসে আছে, পশু জবাই খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিষ্ঠার সাথে কেবল খোদা তা'লার ভালোবাসায়, খোদার ঈবাদাতের উদ্দেশ্যে ঈমান সহকারে পশু জবাই করে এমন কুরবানীকে আরবিতে 'নুসক' বলা হয়েছে, যার আরেকটি অর্থ অনুগত্য।

আসলে আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন, কে কোন উদ্দেশ্যে কুরবানী করছে তা তিনি

ভাল করেই জানেন। আসলে মানুষের মধ্যে সকল লোভ লালসা দুর করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সকল পশুত্বকে বিসর্জনের শিক্ষাই হলো কুরবানীর শিক্ষা। তাই কুরবানীর অন্যতম ধর্মীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা।

কাজী নজরুল ইসলাম তার এক কবিতায় বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন- 'মনের পশুরে কর জবাই/পশুরাও বাঁচে বাঁচে সবাই।' এই পশু কুরবানী সম্পূর্ণ রূপক। আল্লাহর পথে ত্যাগই ঈদের আসল শিক্ষা। আল্লাহর নামে পশু কুরবানী করে তা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মানে দান নয়, তা ত্যাগ। তাই তো কবি নজরুল 'ঈদজ্জোহা' কবিতায় লিখেছেন, 'চাহি নাকো দুম্বা-উট, কতটুকু দান? ও দান ঝুট। চাই কুরবানী, চাই না দান।'

আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা আল্লাহর নামে কুরবানী করে তাদের জন্য সীমাহীন সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময় কুরবানীর বিষয়ে তার উম্মতকে নসিহত করেছেন। কারো হৃদয়ে যদি এমন ধারণার উদ্রেক হয় যে, প্রতি বছরই তো কুরবানী দিয়ে যাচ্ছি এবার না হয় দিলাম না, এমনটি চিন্তাভাবনা মোটেও ঠিক নয়, কেননা কুরবানী শুধু একবারের জন্য নয় বরং তা সারা জীবনের জন্য। হাদিস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হে লোক সকল! জেনে রাখ, প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ঈদ গাহের কাছে না আসে' (ইবনে মাজাহ)। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল করিম (সা.) মদীনায় ১০ বছর অবস্থান করেছেন এবং বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)। মহানবী (সা.) বলেছেন, কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই সবচেয়ে বড় ইবাদত। কুরবানীর জন্তুর শরীরের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে কুরবানীদাতাকে একটি করে সওয়াব দান করা হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত জবাই করার সময় মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় (মেশকাত)। কুরবানীর বিনিময়ে সওয়াব পেতে হলে অবশ্যই কুরবানীটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন, 'কুরবানীর জন্তুর রক্ত-মাংস কোনো কিছুই আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না। তার কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া' (সূরা আল-হাজ: ৩৭)। অতএব তাকওয়া তথা খোদাভীতি লাভের উদ্দেশ্যেই এ কুরবানী। আর প্রকৃত কুরবানী হলো নিজ আত্মার কলুষতাকে জবাহ করা, আত্মার আমিত্বকে জবাহ করা, আত্মার অহংকারকে জবাহ করা।

এখন আমাদেরকে ভাবতে হবে, আমাদের এ কুরবানী কি তাকওয়ার কুরবানী নাকি লোক দেখানো কুরবানী? মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা এটাই, হে আল্লাহ! আমাদের এ কুরবানী তুমি গ্রহণ কর আর আমাদের আত্মাকে পবিত্র কর।

masumon83@yahoo.com

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَاحَبِیْبَ اللّٰہِ

নবীজি (সা.)-এর সালাম

সিবগাতুর রহমান

হে মসিহে মাওউদ (আ) ওগো মসিহে মাওউদ (আ.)
জানাই তোমারে নবীর (স.) সালাম মাহদিয়ে মাসউদ।

ঊর্ধ্ব গগনে হারানো দ্বীনকে ধরায় নামালে তুমি
তোমার জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় পুণ্য হইলো ভূমি
তুমিই ঈসা, মসিহ ও মাহদী, তুমিই উম্মতি নবী
তুমিই দিয়াছো মৃত ইসলামেরে নবরূপ নব ছবি।

গহীন তিমিরে হাজার বছর ছিলো যে মুসলমান
তোমার অসীম প্রেমের টানে ফিরে এলো ইসলাম
দ্বীনের কালিমা চোখের জলে ধুয়েছিলে দিবানিশি
দেখিলো দুনিয়া তোমার প্রেমের স্বাক্ষী রবি শশি।

শয়তান সবে জোট বেঁধেছিলো নাশিতে দ্বীনের রথ
অশুর শক্তি নিধন করিয়া তুমি দেখাইলে পথ
দুনিয়ারে কভূ করোনি তো ভয় ভালোবেসে ইসলাম
জানাই আজিকে তোমার চরণে লাখো কোটি সালাম।

দাজ্জালি ছায়া শকুনের মতো গ্রাস করেছিলো দ্বীন
মুখোশ পরিয়া উলামার দলে আঁধারে ছিলো বিলীন
লিখিয়া বারাহিন তুমি রুখেছিলে যত ছিলো দূর্নাম
জানাই আজিকে তোমার চরণে লাখো কোটি সালাম।

হে মসিহে মাওউদ (আ.) ওগো মসিহে মাওউদ (আ.)
জানাই তোমারে নবীর (স.) সালাম মাহদিয়ে মাসউদ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সঠিক সময়ে আগমনকারী এক প্রেরিত পুরুষ

মোহতরম মোহাম্মদ লুকমান মাজোকা
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানী।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۳﴾ وَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴﴾
ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۵﴾

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল। আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। [সূরা আল জুমুআ: ৩-৫]

সুধী দর্শক শ্রোতা! পথভ্রষ্টতা এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতনের যুগে পৃথিবীতে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানবতা ফিরিয়ে আনার উপকরণ সৃষ্টি করাই হল আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত বিধান। কেননা সকল খারাপ কাজের সংশোধন হতে হবে এটিই সাধারণ নিয়ম। এমনটি না করা হলে খারাপ কাজের বৃদ্ধির ফলে তা ক্ষতি এবং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যদিও মানুষের প্রকৃতিতে সেই চিন্তাশক্তি ও সাধারণ জ্ঞান দান করেছেন যার মাধ্যমে তারা সত্যকে চিনতে পারে এবং সঠিক ও ভুলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে কিন্তু তবুও তিনি তাঁর রহীম এবং রহমানিয়্যতের গুণে মানুষকে আধ্যাত্মিক পথভ্রষ্টতার যুগে একা ছেড়ে দেন না বরং কেবল স্বীয় অনুগ্রহে নবী-রসূল প্রেরণ করে মানুষকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে পবিত্র করার উপকরণ সৃষ্টি করেন যাতে তারা তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সেই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যেটিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে **"পরিপূর্ণ কল্যাণ"** নামে অভিহিত করেছেন। মানুষের জন্য নবীদের উপস্থিতি একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে এক স্থানে বলেন, "নবীর উপস্থিতি এ কারণে প্রয়োজন যেন তিনি নিজের দ্বারা মানবোৎকর্ষের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন আর নিজ সত্তার মাধ্যমে বান্দার অধিকার এবং খোদার অধিকার এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সালেকীন (খোদার পথের অনুসারী) ও মুজাহেদীন (খোদার পথে জীবনোৎসর্গকারী)-দের সাহস আরো দৃঢ় করতে পারেন।" [সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া, পৃ: ২৩২]

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে সে সকল যুগ এবং অধঃপতনের কথা উল্লেখ করেছেন যার সংশোধনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে নবী প্রেরণ করেছেন। কুরআন করীমে আমরা পড়ে থাকি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত নূহ (আ.)-কে সেই সময় পাঠিয়েছিলেন যখন তাঁর জাতি শির্ক, অবিচার এবং অত্যাচার-নিপীড়নের দিক দিয়ে সীমাতিক্রম করেছিল। হযরত শোআইব (আ.)-কে সেই সময় প্রেরণ করেছিলেন যখনকিনা তাঁর জাতি অহঙ্কার, অরাজকতা এবং ব্যাবসায়িক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে চরম

পর্যায়ের অবিবেচক সাব্যস্ত হয়েছিল। হযরত লূত (আ.) তাঁর জাতিকে অশ্লীলতা এবং পাপাচার থেকে বাঁচার উপদেশ দিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে ফেরাউনের অত্যাচার ও দাসত্ববরণ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষামালাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং স্বীয় জাতির পাষণ্ডতাকে দূর করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন। সর্বোপরি নিজ নিজ যুগের পরিস্থিতি এবং জাতির সংশোধনের প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নবীকে সে অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানবতা যখন পরস্পর জাতিসমূহের মাঝে বিস্তৃত হতে থাকল তখন এমন একটি শিক্ষা অবতীর্ণ করা আবশ্যকীয় ছিল যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য হবে। আর সে অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি সকল নবীদের মুকুট এবং যাঁর শিক্ষামালা সর্বদা সমগ্র পৃথিবীর জন্য ছিল। এটি এমন শিক্ষা যা মানুষের স্বভাব অনুযায়ী তাকে প্রজ্ঞা, পবিত্রতা এবং মধ্যম পন্থা শিখিয়ে থাকে। এটি এমন শিক্ষা যার ফলে মানুষ উন্নতি করে একজন খোদাওয়ালা মানুষ হতে পারে যে কিনা খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির শুভ কামনায় কায়মনোবাক্যে রত থাকে। মহানবী (সা.) নিজেই এ শিক্ষার মূর্তমান প্রতীক ছিলেন আর এ কারণেই পবিত্র কুরআন করীমে এই ঘোষণা দেয়া হয়, **"লাক্বাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্"** অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' [সূরা আল্ আহযাব: ২২] আরো বলা হয়েছে, **"ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহবিবকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম"** অর্থাৎ, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এমনটি হলে) আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।' [সূরা আলে ইমরান: ৩২]

সংক্ষেপে এটি বলা যায়, নবীদেরকে তখনই পাঠানো হয় যখন-

- মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিকতা বিলীন হয়ে যায় এবং তারা খোদা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের শির্‌কে লিপ্ত হয়ে যায়।
- যখন মানুষ পরিপূর্ণভাবে জগতপূজারী এবং জাগতিক স্বাদ-প্রস্বাদ পাওয়ার জন্য মগ্ন হয়ে যায় আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায়।
- যখন অত্যাচার-অনাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
- যখন একজন ধর্মের অনুসারী নিজ ধর্মের মূল শিক্ষা এবং ধর্মীয় চেতনা ভুলে বসে।

সুতরাং পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যেভাবে নিজ ধর্মের শিক্ষামালা এবং সেটির আসল চেতনা ভুলিয়ে দিয়েছিল তদ্রুপ ঘটনা ইসলামের মাঝেও ঘটেছে যার সংবাদ মহানবী (সা.) আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন,

يأتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة و هى خراب من الهدى علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود.

অর্থ: 'মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলাম কেবল নামমাত্র এবং কুরআনের শুধু অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেতনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।' [বায়হাকী, মিশকাত, খণ্ড: ১, পৃ: ৩৮]

একইভাবে এমন যুগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে আরো একটি স্থানে মহানবী (সা.) এক দাজ্জালের সাথে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে কিনা খোদা তা'লার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং জাগতিক মোহের দিকে উস্কাবে। এই দাজ্জাল বলতে কোন অদ্ভুত রকমের সৃষ্টি নয় বরং একটি চিন্তার নাম যা রাজনৈতিক এবং দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ। আর যা বিজ্ঞান এবং উন্নতির এই যুগে খোদা তা'লার নিকট থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে কেবল জাগতিকতার শিক্ষা দেয় যা দেখে মনে হয় যেন এই জগতই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং ভিত্তি।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! চলুন, আজ থেকে দেড়'শ বছর পূর্বেকার যুগের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখি যে, তখনকার পৃথিবী কেমন ছিল আর কেনইবা এটিই সেই সময় যখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মের সংস্কারক এবং সংশোধকের আগমন অবশ্যক ছিল?

অতএব এটি জানা থাকা দরকার যে, ঊনবিংশ শতাব্দিতে পৃথিবীতে এক নতুন বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পযুগ শুরু হয় যার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে পাওয়া যায় না। এই উন্নতি যেমন একদিকে মানুষকে আরাম-আয়েশ এবং জাগতিক সহজলভ্যতা প্রদান করেছে অপরদিকে এক নতুন দাসত্ব ও দারিদ্রতার জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিস্কার কেবল মানুষকে নতুন নতুন শিল্প ও উন্নত চিকিৎসার সাথেই পরিচয় করায় নি বরং এর পাশাপাশি এমন ক্ষতিকর অস্ত্র বানানোর শক্তিও দিয়েছে যা পূর্বের চেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে এবং অধিক সংখ্যায় বিরোধীদের মারতে সক্ষম। নতুন নতুন ভ্রমণযানের আবিস্কার কেবল মানুষের পারস্পরিক ভ্রমণ এবং যোগাযোগ মাধ্যমকেই সংক্ষিপ্ত ও উন্নত করে নি বরং এর পাশাপাশি সৈন্যসামন্ত নিয়ে দ্রুত স্থানান্তরের সুবিধাসহ শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোকে এই সুযোগ করে দিয়েছে যাতে তারা জাগতিক লাভের খাতিরে দুর্বল দেশসমূহের উপর পূর্বের চেয়ে দ্রুত এবং জোরাল আক্রমণ করে তাদের ধনসম্পদ লুটপাট করতে পারে। জাগতিক ইপ্সার ফলে এমন এক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এর স্বাদ পাওয়ার জন্য

চারিত্রিক সমস্ত গুণাবলী জলাঞ্জলি দেয়াকে বৈধ জ্ঞান করা হয়েছে। ইউরোপ এবং পশ্চিমা বিশ্বে সম্পদের লোভ, জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, অপরাধ প্রবণতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক অধঃপতন অনেক দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রেঙ্গ নামে ঊনবিংশ শতাব্দির বিখ্যাত একজন আমেরিকান পাদ্রী আমেরিকা শহরে ছড়িয়ে পড়া খারাপ কাজগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছেন আর তা হল, "সম্পদের পূজারী, লোভ-লালসা, অবিশ্বস্ততা, অনিয়ম, লক্ষ্যহীন, মদ্যপান প্রভৃতি .....।"

বিজ্ঞানের উন্নতির পাশাপাশি নতুন আঙ্গিকে নাস্তিক্যবাদের চিন্তা ও দর্শন উদাহরণস্বরূপ, Nihilism (ধবংসবাদ) অথবা সমাজবাদও এসব দেশে সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের সাথে এর সংযোগ হল, এই সময়টাতেই তাদের সবচেয়ে বেশি অধঃপতন হয়েছিল। মুসলমানরা অতীতের বুযূর্গ এবং পীরদের পূজা করার মত রীতি-রেওয়াজের মাঝে আটকে ছিল। অধিকাংশ আলেম-উলামা তাদের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবল অন্ধ অনুসরণের শিক্ষার মাধ্যমে সকল প্রকার হিকমত থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। এর ফলাফলস্বরূপ মুসলমানদের চিন্তার গণ্ডি থেমে গেল। অধিকাংশ আলেম-উলামা নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহকে অস্বীকৃতি জানাল এবং এগুলোকে অনৈসলামিক আখ্যা দিল। প্রায় সকল মুসলমানের বিশ্বাস এটিই ছিল যে, কুরআন করীমের বেশ কতক আয়াত রহিত হয়ে গেছে পরন্তু এমন এক জিহাদের ধারণা তাদের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করেছে যার সাথে কুরআনের শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই। একই সাথে তারা বিশ্বাস করতো যে, ইলহামের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে যার বিপরীতে একটি দল দোয়ার প্রভাব এবং অন্যান্য নিদর্শনের ক্ষেত্রে তাদেরকে অস্বীকৃতি প্রদান করতো। ইসলামের উপর চারদিক থেকে আক্রমণ হচ্ছিল। বিশেষ করে, খ্রিষ্টান মিশনারীরা ইসলামকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছিল। তখনকার দিনের মুসলমান চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে নিম্নোক্ত অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তখনকার উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি বলেন,

ধর্মও নেই, ঈমানও নেই
রয়েছে কেবল ইসলাম নামটি

আবুল কালাম আজাদ লিখেন, "এমন কোন দুর্ভাগ্য এবং সহিংসতা নেই যা ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করে নি। আর পথভ্রষ্টতার চরম ও চূড়ান্ত অবস্থা এই উম্মতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।"

আহলে হাদীস পত্রিকা লিখেছে, "প্রকৃত কথা হল, আমাদের মাঝ থেকে কুরআনের শিক্ষা বিলীন হয়ে গেছে। কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন আবশ্যক করে নিয়েছি ঠিকই কিন্তু খোদার কসম! আমরা এটিকে কেবল সাধারণই নয় বরং অতি সাধারণ এবং অকর্মণ্য কিতাব হিসেবে জ্ঞান করি।"

বিখ্যাত মুসলমান আলেম জামালউদ্দীন আফগানী সেই যুগের মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেন,

قد فسدت اخلاق المسلمين الى حد ان لا امل بان يصلحوا۔ الا بان ينشائوا خلقا جديدا و جيلا مستانفا۔

অর্থ: 'মুসলমানদের চরিত্র এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে যে, এর ভাল হবার আর আশা নেই। কতইনা ভাল হতো! যদি সবকিছু নতুন করে সৃষ্টি হতো এবং নতুন যুগের শুরু হতো।' [মুক্বাম জামালউদ্দীন আফগানী, পৃ: ৮৮]

সর্বোপরি সেই যামানার চিন্তাবিদগণ এটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত পরিস্থিতি ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে তাই এখন সংশোধন ব্যতিরেকে কোন পথ নেই। এ কারণে বহির্বিশ্বের সবখানে সংশোধন এবং পরিবর্তনের ধ্বনি উচ্চকিত হওয়া শুরু হল। আর এই লক্ষ্যে সে যুগেই বিভিন্ন নতুন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংশোধনমূলক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিজম কিংবা Lebensreform-এর আন্দোলন, হিন্দুদের মাঝে ব্রহ্মসমাজী আন্দোলন, খ্রিষ্টানদের মাঝে Great Awaking-এর আন্দোলন আর সেই যুগেই কতক খ্রিষ্টান ব্যক্তি মসীহের দ্বিতীয় আগমনের ঘোষণা করতো উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত খ্রিষ্টান পাদ্রী William Miller ঘোষণা করলেন, ১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে মসীহের আগমন হবে। আবার মুসলমানদের সংশোধনের জন্য কিছু মানুষ স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের অবনমিত অবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা করল। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা এবং আন্দোলন কেবলমাত্র জাগতিক সিদ্ধি লাভের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক স্থানে বলেন,

"কেউ কেউ বলে, আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা এবং মাদ্রাসা স্থাপন করাই ধর্মের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারা জানে না, ধর্ম কীসের নাম এবং আমাদের অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্য কী আর কীভাবে ও কোন্ পথে সেসব উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে। সুতরাং তাদের জানা উচিত, এ জীবনের পরম উদ্দেশ্য হল, খোদা তা'লার সাথে সেই সত্যিকার ও সুনিশ্চিত সংযোগ স্থাপন করা যা প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে নাজাতের উৎসে পৌঁছিয়ে দেয়। অতএব মানুষের বানোয়াট চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা পূর্ণ একীনের (বিশ্বাসের) এসব পথ কখনো উন্মুক্ত হতে পারে না। আর মানুষের বানানো দর্শন এক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না। বরং এ আলো খোদা তা'লা সব সময় তাঁর বিশিষ্ট বান্দাগণের মাধ্যমে অন্ধকার যুগে আকাশ থেকে নাযিল করেন। আর যিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেন তিনিই আকাশের দিকে নিয়ে যান।" [ফতেহ ইসলাম, পৃ: ৪১-৪২]

সুধীবৃন্দ! আমি এতক্ষণ সে সকল অবস্থার বর্ণনা করেছি যা থেকে এটিই প্রকাশিত হয় যে, আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সকল শর্ত ঊনবিংশ শতাব্দিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেই যুগে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সংশোধনী প্রচেষ্টাই এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, গোটা জগতের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করছিল। আর এ

কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আগমনের যুগ সম্পর্কে বলেন,

کیوں عجب کرتے ہو گر
میں آ گیا ہو کر مسیح خود
مسیحائی کا دم بھرتی ہے
یہ باد بہار

অর্থ: 'আমি যদি মসীহ্ হয়ে আসি তবে অবাক কেন হচ্ছো!

এই মৃদুমন্দ বসন্ত নিজেই মসীহি শ্বাস-প্রশ্বাসে উজ্জীবিত হতে চায়।'

وقت تھا وقت مسیحا نہ
کسی اور کا وقت میں نہ
آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

অর্থ: 'সময় হল মসীহের আগমনের অন্য কারো নয়,

আমি না আসলে অন্য কেউ অবশ্যই এসে যেতো।'

আমি ইতোপূর্বে যেভাবে বলেছি, মহানবী (সা.) এবং অন্যান্য নবীগণও এই যুগের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন কিন্তু একইসাথে এই যুগে একজন মসীহ্ মওউদ-এর আগমনের সুসংবাদও দেয়া হয়েছে যিনি কিনা পুনরায় জগদ্বাসীকে খোদার সাথে সম্পৃক্ত করবেন।

মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীসে মসীহ্ মওউদ-এর আগমন সংক্রান্ত লক্ষণাবলী পাওয়া যায় যেমন-

- মসীহ্ মওউদ অনারবি হবে।
- পৃথিবীতে পুনরায় ঈমান প্রতিষ্ঠা করবে।
- মানবতার চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার সংশোধন করবে।
- পৃথিবীতে সন্ধি স্থাপন করবে।
- তাঁর যুগে ভ্রমণের নতুন মাধ্যম আবিস্কার হবে।
- তাঁর জন্য নিদর্শনস্বরূপ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ প্রকাশিত হবে।
- তিনি একটি শুভ্র মিনারের পাশে দামেস্কের পূর্বদিকে আবির্ভূত হবেন।

এগুলো হল সেরকম কিছু নিদর্শন যা মহানবী (সা.) হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

সম্মানিত সুধী! উপরোক্ত সকল নিদর্শন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ কারণেই তিনি খোদা তা'লার নির্দেশে সেই পথভ্রষ্টতার যুগে মসীহ্ মওউদ এবং মাহ্‌দীয়ে মা'হুদ হবার ঘোষণা দিয়েছেন যাতে ইসলাম ধর্ম পুনরায় উজ্জীবিত হয় এবং পৃথিবীতে পুনরায় খোদার প্রতি ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

"খোদা তা'লা বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এভং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও গোমরাহীতে পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারের জন্য ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। এই যুগও এমন ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দি শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি এই আদেশের অনুবর্তিতায় জনগণকে লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার শিরোভাগে খোদার তরফ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁর আসার কথা ছিল আমিই সেই ব্যক্তি; যাতে ঐ ঈমান- যা পৃথিবী থেকে উঠে গেছে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও আমল সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করি।" [তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ: ৩]

সর্বোপরি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সাথেই সংশোধনের একটি নতুন যুগ শুরু হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই মুসলমানদের আকীদা এবং আমল উভয়ের সংশোধন করেন। তিনিই (আ.) মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া এই বিশ্বাস যে, কুরআন করীমের কিছু আয়াত রহিত হয়ে গেছে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে খণ্ডন করে বলেন, কুরআন করীমের মধ্য থেকে কোন কিছু বাদ দেয়া এবং কিছু সংযোজন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনিই (আ.) কুরআনের শিক্ষামালার আলোকে এই ঘোষণা দেন, ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং ইসলাম অকাট্য দলীল ও ভালবাসার ধর্ম। তিনি (আ.) এটি স্পষ্ট করেছেন যে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। একটি হল, খোদার বাণী এবং অপরটি তার বাস্তব প্রতিফলন। মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া এই বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন তা তিনি (আ.)-ই অকাট্য দলিল প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি (আ.) কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে এটি শিখিয়েছেন, ধর্মের নামে যুদ্ধের দিন শেষ আর সবচেয়ে বড় জিহাদ হল, মানুষের নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করা। তিনি (আ.) সারাজীবন ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষামালাকে জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন এবং প্রচারের কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি (আ.) ৮৫টির অধিক পুস্তক রচনার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত ও মূল চেতনা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন যা আজও স্বীয় শক্তি ও প্রভাববলে পাঠকদেরকে অবাক করে থাকে। তিনি (আ.) কুরআন করীম দিয়েই এ যুগের সমস্যার সমাধান করেছেন এবং এমন এক জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন যার লক্ষ্য ছিল, এমন লোকদের একত্রিত করা যারা সেসব আধ্যাত্মিক শিক্ষামালার উপর আমল করে জগতের সামনে একটি আদর্শরূপে দাঁড়াবে।

আর তিনি (আ.) তাঁর আগমনের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন তা হল, জীবন্ত খোদার প্রতি ঈমানকে উজ্জীবিত করা এবং প্রমাণ করেছেন যে, খোদা তা'লা এই যুগেও কথা বলেন যেভাবে তিনি পূর্বে বলতেন। কুরআন করীম এবং মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফলে যে মানুষ সেই মর্যাদায়

অধিষ্ঠিত হতে পারে যা তাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে সেটিও তিনি (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট করেছেন। আর এর ফলে মানুষ রূইয়্যা, কুশুফ এবং ইলহামের মাধ্যমে জীবন্ত খোদাকে অবলোকন করে যারপর সন্দেহের সকল পর্দা উন্মোচিত হয়। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

"যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হিসেবে পাঠিয়েছেন তা হল, খোদা এবং তাঁর বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে তলানি জমে গেছে সেটি পরিস্কার করে যেন ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ককে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি আর সত্যতা প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সন্ধি স্থাপন করি আর ধর্মের যেসব সত্যতা জগদ্বাসীর চোখের আঁড়াল ছিল সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসি আর সেই আধ্যাত্মিকতা যা প্রবৃত্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। খোদার সেই শক্তিসমূহ যা মানুষের ভিতর প্রবেশ করে মনোযোগ কিংবা দোয়ার মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় তা কেবল মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই নয় বরং বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সেগুলো সম্পর্কে বিবরণ দেই আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, সেই নিষ্ঠা এবং জাজ্জ্বল্যমান একত্ববাদ যা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত আর যা বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে সেটির চারা যেন পুনরায় স্থায়ীভাবে জাতির মাঝে প্রোথিত করি। আর এসব আমার সামর্থবলে বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় বরং এগুলো সেই খোদার শক্তিবলে বাস্তবায়িত হবে যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর অধিপতি।"

সম্মানিত দর্শক শ্রোতা! খোদা তা'লার নিয়মসমূহের মাঝে এটিও একটি নিয়ম যে, নবীদের আগমনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের মাঝেও তীব্রতা এবং উৎকর্ষতা থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন,

"ঐশী মনোনয়নের মাধ্যমে যখন কোন নবী কিংবা রসূল এসে থাকে তখন তাঁর কল্যাণে সার্বিকভাবে প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী আকাশ থেকে একটি জ্যোতি অবতীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিকতার ব্যাপক প্রচার-প্রসার দৃষ্টিতে আসে। সেই সময় প্রত্যেকে সত্যস্বপ্ন দেখার বিষয়ে উন্নত মার্গে পৌঁছুতে থাকে এবং ইলহাম পাওয়ার সামর্থবান ব্যক্তিরা ইলহাম পেয়ে থাকে আর আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। ..... এই সকল কল্যাণের কারণ প্রকৃতপক্ষে সেই রসূল হয়ে থাকে ..... নির্বোধেরা মনে করে, আমার যোগ্যতাবলে এমনটি হয়েছে কিন্তু কেবল সেই নবীর কল্যাণেই জগদ্বাসীর নিকট এই ইলহাম এবং সত্যস্বপ্নের প্রস্রবনধারা উন্মোচন করা হয়।" [হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২২, পৃ: ৬৪]

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের ফলে সেই আধ্যাত্মিক কল্যাণেরও বিস্তৃতি ঘটেছে। তাঁর (আ.) সাহাবীরা সেই বরকত থেকে একটি অংশ লাভ করেছেন। একবার হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, "মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে আপনি কী লাভ করেছেন? তখন তিনি (রা.) বলেন, এর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল স্বপ্নে সাক্ষাত হতো আর এখন জাগ্রত অবস্থাতেও সাক্ষাত হয়।"

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন লুধিয়ানায় ছিলাম তখন একজন সূফী হুযূর (আ.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিতে পারেন? তখন তিনি (আ.) বলেন, এজন্য শর্ত হল, আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যার উপর খোদার কৃপা রয়েছে'। আর আমি সেই রাতেই মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখি।

হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নু'মানী (রা.) স্বপ্রণীত পুস্তক 'তাযকেরাতুল মাহ্দী'-তে বর্ণনা করেন, তিনি একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন আর তার ঘর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরের পাশেই ছিল। একদিন তার কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। রাত ১২টার দিকে তিনি ব্যথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিছানা থেকে উঠে দেয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসে গেলেন। ঠিক সেই মূহুর্তে তিনি (রা.) একটি কাশফে দেখলেন যে, পাঁচজন ফিরিশতা তার সামনে বসে নিজেদের মাঝে বলাবলি করছে। একজন বলল, সাহেবযাদার ব্যথা অনেক বেশি। তার কথা শুনে আরেকজন বলল, হ্যাঁ, ব্যথা অনেক বেশি। তৃতীয়জন বলল, এর চিকিৎসা কী? চতুর্থজন বলল, এর চিকিৎসা হল, তার ব্যথা আমরা সবাই ভাগাভাগি করে নেই। পঞ্চমজন বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর সবাই হাত উপরের দিকে তুলে আড়মোড়া ভাঙল এবং পীর সাহেবকেও ইশারা দিল যেন তিনিও এমনটি করেন। এই কাশফ প্রায় আধা মিনিট পর্যন্ত চলছিল। কাশফ শেষ হতে না হতেই পীর সাহেবের ব্যথা দূর হয়ে গেল। সকালে পীর সাহেব এই পুরো ঘটনাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনালেন যা শুনে তিনি (আ.) বলেন, "এই কাশফ সঠিক কেননা আমিও সে সময় দেয়ালের সাথে কোমর ঠেস দিয়ে বসেছিলাম এবং সে সময় আমার উপর ইলহাম হল।" এই ঘটনা যখন পরবর্তীতে হযরত মওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-কে পীর সাহেব শুনালেন তখন তিনি (রা.) বলেন, "নিঃসন্দেহে পুণ্যবানদের সঙ্গে থাকলে এমন কল্যাণই পাওয়া যায়।"

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বয়আতনেয়ার ঘোষণা দিলেন তখন তার বন্ধু হযতে মুন্সী আব্দুর রহমান (রা.) ইস্তিখারা করলেন। অতঃপর তার উপর ইলহাম হল, "আব্দুর রহমান! এসো।" এরপর তিনি বয়আত নেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন।

হযরত মওলানা ইবরাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯৫৫ সালে মওলানা ফযল ইলাহী আনওয়ার সাহেব যিনি জার্মানীতে দীর্ঘকাল মুবাল্লিগ হিসেবে

সেবা প্রদান করেছেন তার নিকট ছেলে সন্তান হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন জানান। কিছুদিন দোয়া করার পর হযরত মওলানা বাকাপুরী (রা.)-এর নিকট ইলহাম হল, "তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিবে আর সে ছেলের নাম যাকারিয়া রাখবে।" বর্তমানে ফযল ইলাহী আনোয়ার সাহেবের এই ছেলে নরওয়েতে বসবাস করেন যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণের জীবন্ত প্রমাণ।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তার সাত প্রজন্মকে রিয্‌ক দেয়া হবে এবং তাদের মাঝে কেউই অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে না। বর্তমানে হযরত মওলানা রাজেকী (রা.)-এর বংশধর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং সেই ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত কল্যাণের জলজ্যান্ত প্রমাণ।

হযরত মালেক গোলাম ফরিদ সাহেব (রা.) যিনি ১৯২৩-১৯২৪ সালে জার্মানীতে মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, তার জার্মানীতে আসার পূর্বে একটি রুইয়া দেখেন যেখানে এক ব্যক্তি তাকে বলে, "আপনি জার্মানীতে যাচ্ছেন কিন্তু ওখানকার লোকেরা তো বেশ কেতাদুরস্থ (অর্থাৎ সুরুচিসম্মত) প্রকৃতির। আপনার কুরআন তো অনেক পুরোনো। তারা সেটিকে পছন্দ করবে না।" এটি শুনে রুইয়ার মধ্যেই তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, "জার্মানীর জন্য আমি যে কুরআন সুন্দর করে বাধাই করে রেখেছি সেটি জার্মানবাসীদের তাক লাগিয়ে দিবে।"

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি শব্দ অদ্ভুতভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। জার্মান ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মলাটে ছাপা হয়। এখন পর্যন্ত জার্মানীতে লক্ষ্যাধিক কুরআন বিনিময় হয়েছে এবং প্রায় প্রতিদিন এর চাহিদা এসে থাকে আর জার্মানী জামাতের পুস্তকাবলীর মধ্যে এটিরই সর্বাধিক অর্জন রয়েছে।

লক্ষ লক্ষ নিদর্শন, রুইয়া-কাশ্‌ফ এবং ইলহামসমূহের মধ্যে এগুলো গুটিকয়েক উদাহরণ মাত্র আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে তারাই এর দর্শন পেয়েছে যারা তাঁর (আ.) পবিত্র সান্নিধ্যের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের চেহারায় নিদর্শন রয়েছে।" একইভাবে মহানবী (সা.)-কে যখন একবার জিজ্ঞাসা করা হল, কার সান্নিধ্য লাভ সর্বাপেক্ষা উত্তম? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, "তার সান্নিধ্য সর্বাপেক্ষা উত্তম যাকে দেখে তোমার খোদাকে মনে পড়ে যায়।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপরও একবার এই ইলহাম হল,

"عشق الٰہی وتے منہ پر ولیاں ایہہ نشانی"

অর্থ: 'খোদার নেক বান্দাদের চেহারায় ঐশী প্রেমের জ্যোতি বিকশিত হয়।' [বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২১, পৃ: ২৪২, বদর পত্রিকা, ৮ মে-১৯০৩]

তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "খোদার প্রকৃত বান্দারা যারা খোদা তা'লার সাথে ভালবাসা এবং প্রেমের সম্পর্ক রাখে তারা নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করতে কেবল ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাদের নিকট সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং গভীর মারেফতের দরজা উন্মোচিত হয়। ..... আর অলৌকিকভাবে তাদের হৃদয়ে কুরআনের অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ঐশী কিতাবের গূঢ়তত্ত্ব নাযিল করা হয় এবং তাদেরকে এসকল নিগূঢ় রহস্য ও ঐশী জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বানানো হয়। ..... আর তাদের হৃদয় রূহুল কুদ্দুসের ছায়াতলে আবৃত থাকে। তারা খোদার হয়ে যায় এবং খোদা তাদের হয়ে যায়। তাদের দোয়া অলৌকিক নিদর্শন দেখায়। তাদের জন্য খোদা স্বীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করে। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীর বিপরীতে জয় লাভ করে। তাদের চেহারায় ঐশী প্রেমের জ্যোতি বিকশিত হয়। তাদের ঘরেদুয়ারে অনবরত খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে বলে মনে হয়। ..... খোদা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের দোয়া শুনে থাকেন এবং অদ্ভুতভাবে সেগুলো গৃহীত হবার নিদর্শন প্রকাশ করেন এমনকি যুগের রাজা-বাদশাহ্‌রা তাদের দুয়ারে এসে থাকে। মহা প্রতাপান্বিত খোদার প্রতাপ তাদের হৃদয়ে দেখা যায় এবং একটি ঐশী প্রভাব তাদেরকে দান করা হয়। আর একটি রাজকীয় ভাব তাদের চেহারায় ফুঁটে ওঠে। ..... তারাই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী রাজাধিরাজ এবং অন্ধকার দূরকারী সূর্য হয়ে থাকে।" [মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-স্বীয় লেখনীর আলোকে, খণ্ড: ২, পৃ: ৮১৩]

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহ তাঁর তিরোধানের পরপরই শেষ করে দেন নি বরং তাঁর (আ.) খলীফাদের মাধ্যমে এখনো পৃথিবীতে রয়েছে। এখন আমরা যদি খোদা তা'লার নৈকট্য এবং সেই আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে উপকৃত হতে চাই যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল তবে আমাদেরও খোদার সেই নিষ্ঠাবান পুরুষের সান্নিধ্য থেকে লাভবান হওয়া উচিত যিনি বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধিত্বস্বরূপ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। যাঁর চেহারায় ঐশীপ্রেমের জ্যোতি বিকশিত হয়, যাঁকে ঐশী জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, যাঁর দোয়া খোদা তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে শুনে থাকেন এবং অদ্ভুতভাবে তা গৃহীত হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ করেন, যাঁর ঘরেদুয়ারে রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়, যাঁকে এক ঐশী প্রভাব দান করা হয়েছে, যাঁর চেহারায় একটি রাজকীয় ভাবে প্রকাশিত হয়, যাঁর হৃদয়ই হল খোদার আরশ এবং যিনি বর্তমানে আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন।

اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدک المسیح الموعود و بارک و سلم انک حمید مجید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ভাষান্তর: **মামুন-উর-রশীদ**
ওয়াকেফে যিন্দেগী

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৩)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংগে ধর্মীয় বিষয়ে মত-পার্থক্য: কি এবং কেন?

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়-কাল সম্পর্কিত মত-পার্থক্য:

(১.৫) আখেরী যুগে দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ 'যুল-কারনাইন' হিসেবে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর দাবীর বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে মসীহ ও মাহদী হিসেবে দাবীকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)–এর ব্যাখ্যা

সূরা আল কাহফ ঃ ১৮

"অবশেষে সে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌছালো তখন সে সেটিকে এক দুর্গন্ধময় কাদার উৎসে অস্ত যেতে দেখলো। আর সে এর কাছে একটি জাতিকে (বসবাসরত দেখতে) পেল। (তখন) আমরা বললাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি চাইলে (এদের) শাস্তি দিতে পার অথবা এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে পার।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ ও মাহদী (আঃ) বলেছেন ঃ "পবিত্র কুরআনে সূরা কাহফের ৮৭ আয়াতে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে ঃ "অবশেষে যখন সে (যুলকারনাইন) সূর্যাস্তের স্থানে পৌছলো, তখন সে সেটিকে এক দুর্গন্ধময় কাদার উৎসে অস্ত যেতে দেখলো...। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ "কুরআনী এই আয়াতে অনেক গভীর রহস্য নিহিত, যা আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। তথাপি খোদাতা'লা আমার কাছে এর যে অর্থ প্রকাশ করেছেন তা হলোঃ এই আয়াতটি পূর্বাপরের সাথে মিলিত আকারে প্রতিশ্রুত মসিহর বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং এটি তাঁর আবির্ভাবের যুগ নির্ধারণ করে। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ নিজেও একজন 'যুলকারনাইন'। কেননা, আরবীতে শতাব্দীকে 'কারণ' বলে। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যিনি অনাগত একযুগে আবির্ভূত হবেন–তাঁর জন্ম আর তাঁর আবির্ভাব দু'টি শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হবে। আর বাস্তবে আমার সত্তা ঠিক এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আমার সত্তা সকল প্রচলিত ও পরিচিত শতাব্দী–তা সে হিজরী শতাব্দীই হোক বা খৃষ্টীয় শতাব্দী কিংবা বিক্রমাব্দিই হোক–সর্বক্ষেত্রে আমার দুটি সত্তা বিস্তৃত। কোন একটি শতাব্দীতে আমার জন্ম ও আবির্ভাব সীমাবদ্ধ নয়। তাই, আমার জ্ঞানানুযায়ী আমার জন্ম ও আবির্ভাব প্রত্যেক ধর্মমতের শতাব্দীতে সম্প্রসারিত। সুতরাং, এই অর্থে আমিই 'যুলকারনাইন'। অনুরূপভাবে, কিছু হাদীসেও মসীহ মাওউদের নাম 'যুলকারনাইন' বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে সেই অর্থেই 'যুলকারনাইন' ব্যবহৃত হয়েছে, যা আমি ব্যক্ত করেছি।" (লেকচার লাহোর, পৃঃ ৬২)।

দুই যুগের 'যুলকারনাইন'–এর পরিচিতি

পবিত্র কুরআনে সূরা কাহাফ ঃ ৮৪–৯৫ আয়াতগুলোতে বিশেষ উদ্দেশ্যে 'যুলকারনাইন' সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন কালে পারস্যের সম্রাট সাইরাস (৫৯০-৫২৯খৃষ্টপূর্ব) পারস্য এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিখ্যাত শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনে বর্নিত কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন: (ক) তিনি ছিলেন একজন একেশ্বরবাদী এবং পার্শী ধর্মের অনুসারী ধার্মিক এবং ঐশীবানী প্রাপ্ত এবং তিনি অনেক জন–কল্যান মূলক কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন। সেই সংগে তিনি নির্যাতিত এবং বিতাড়িত বনী ইস্রায়েলীদেরকে পুনর্বাসিত করে ছিলেন। (খ) তিনি পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিজয় লাভের পর পূর্ব দিকেও এক বিরাট রাজ্য জয় করেন (গ) তিনি মধ্যাঞ্চলে অভিযান কালে সেখানে অসভ্য বর্বর জাতি দেখলেন এবং তিনি সেখানে ইয়াজুজ–মাজুজ ("এড়ম ধহফ গধমড়মচ) নামক জাতিকে দেখেছিলেন যারা ঐ সকল অঞ্চলে অনধিকারভাবে পুনঃ পুনঃ আক্রমন এবং প্রবেশ করতে দেখেছিলেন এবং সেজন্য প্রবেশ পথগুলোতে কতকগুলো প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়ে সাধারন অধিবাসীদেরকে ইযাজুজ–মাজুজের অত্যাচার থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুত:পক্ষে ঐ সকল গুণ এবং কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে পবিত্র কুরআনে সুরা কাহাফের সংশ্লিষ্ট আয়াত সমুহের যুলকারনাইন বর্ননার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে । (কুরআন মজীদের তফসীর সুরা কাহাফের উপরোক্ত আয়াতসমুহ এবং প্রথম ও শেষের দশটি আয়াত এবং Historians history of the world- Cyrus, the Great অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দশটি আয়াতসহ প্রথম এবং শেষের আরো উল্লেখ যে, প্রাচীন যুগে যেভাবে যুল- কারনাইন' হিসেবে সম্রাট সাইরাস মানব–কল্যান মূলক কার্যাবলী সম্পাদন করেছিলেন এবং বিশেষ ভাবে ইয়াজুজ–মাজুজের অত্যাচার থেকে সমসাময়িক অধিবাসীদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন–তেমনিভাবে আখেরী

যুগেও সেই ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমন থেকে সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। আগমনকারী ঐশী প্রতিশ্রুত সংস্কারক বিশ্ববাসীকে বর্তমান যুগের 'ইয়াজুজ–মাজুজ' অর্থাৎ মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী সামরিক শক্তিজোট এবং বিশ্বযুদ্ধের জন্য মহা–বিধ্বংসী অস্ত্র–শস্ত্রের অধিকারী জাতিসমুহের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আধ্যাত্মিক প্রাচীর–স্বরূপ যথাযথ ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন। ধর্মীয়ভাবে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মসহ পার্থিবতায় নিমগ্ন এবং সম্পূর্নরূপে মোহাচ্ছন্ন জাতিসমুহকে (ধর্মীয় ভাষায় যারা দাজ্জাল বলে পরিগণিত) সতর্কীকরন এবং উদ্ধারের জন্য সঠিক ভাবে পথ–নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পুনর্জাগরন মূলক আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক অর্থে সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় শান্তিপূর্ন পথ ও পন্থার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সাফল্যের সংগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ স্মতর্ব্য যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'যুলকারনইন' সম্পর্কিত বর্ণনা কোনো প্রকার কেচ্ছা–কাহিনী নয়। এই ধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মধ্যে অনেক রহস্য এবং ভবিষ্যদ্বাণী লুকায়িত রয়েছে যা যথা সময়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক গভীর জ্ঞান এবং স্বচ্ছ হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া ঐ ধরনের রূপকাশ্রিত বর্ননার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব নয় (সুরা আলে ইমরান : ৮ অনুযায়ী মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ এবং ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(১.৬) 'আখেরী যুগ' নিরূপনের জন্য 'হুরুফে আবজাদ' (আরবী অক্ষরের সংখ্যামান) পদ্ধতির আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আগমনের সময়কাল হিসেবে ত্রয়োদশ হিজরীর প্রথমাংশ এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দী চিহ্নিত হয়েছে

আরবী বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর বা বর্ণের একটি সংখ্যামান আছে (অন্যান্য ভাষাতেও সংশ্লিষ্ট ভাষার কোন কোন অক্ষর দ্বারা সংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে)। আরবী বর্ণনা মালার ২৯টি বর্ণের সংখ্যাগত মান নিম্নরূপ ঃ আলিফ=১, বা=২, তা=৪০০, সা=৫০০, জীম=৩, হা=৮, খা=৬০০, দাল=৪, যাল=৭০০, রা=২০০, যা=৭ সিন=৬০, শ্বীন=৩০০, সাদ=৯০, যাদ=৮০০, ত্বা=৯, য্বা=৯০০, আইন=৭০, গাইন=১০০০, ফা=৮০, ক্বাফ(বড়ো)=১০০, কাফ(ছোট)=২০, লাম=৩০, মীম=৪০, নুন=৫০, ওয়াও=৬, হা=৫, হামযা=নাই, ইয়া=১০।

'হুরুফে আবজাদ' সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত ঃ

'আবজাদ' সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে সুরা বাকারায় ব্যবহৃত 'আলিফ–লাম–মিম' নামক তিনটি অক্ষরের মধ্যে যেগুলো হলো শব্দ–সংক্ষেপন বা অক্ষর–সমষ্টি (হুরুফে মুকাত্তাত)। মুকাত্তাতের তাৎপর্যসমূহের মধ্যে দুটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হলো ঃ (১) প্রত্যের অক্ষরের একটি নির্দিষ্ট 'গাণিতিক' মান (আবজাদ) রয়েছে (কুরআনের তফসীর–ইবনে জরীর তাবারী প্রণীত)। যেমন ঃ আলিফ=১, লাম=৩০ এবং মীম=৪০ এবং (২) প্রত্যেকটি অক্ষর দ্বারা একটি করে শব্দ–সংক্ষেপন অর্থাৎ মুকাত্তায়াত দ্বারা 'আলিফ লাম মীম' ব্যবহৃত হয়েছে যার সঙ্গে আল্লাহতালার ঐশী গুণাবলীর সম্পর্ক রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যে অর্থ করেছেন তা হলোঃ আলিফ মানে 'আনা' এবং 'লাম' মানে আল্লাহ এবং মীম মানে আলামু অর্থাৎ একত্রে এই তিনটি অক্ষর দ্বারা বুঝায় ঃ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানি (বিস্তারিত জানার জন্য সুরা বাকারা কুরআন মজীদ–এর তফসির দ্রষ্টব্য)।

আরো উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখিত একটি ঘটনার বিবরণ রয়েছে যেখানে একজন প্রশ্নকারী ইহুদীর উদ্দেশ্যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে উত্তর প্রদান করেছিলেন তার অর্থ হলোঃ আলিফ–লাম–মিম দ্বারা ৭১ বছর এবং 'আলিফ–লাম–মিম–সাদ দ্বারা ১৬১ বছর এবং আলিফ–লাম–রা দ্বারা ২৩১ বছর এবং 'আলিফ–লাম–মিম–রা' সংখ্যাগত মান ২৭১ বছর বুঝানো হয়েছে। বুখারী শরীফের বিস্তারিত বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। এসম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের প্রথম–যুগের গৌরবময় তিন শতাব্দী এবং পরবর্তীকালে সুরা সাজদা ঃ ৬ আয়াত অনুযায়ী এক হাজার বছরের অন্ধকার রাত্রিতুল্য কলহ–বিবাদ এবং দল–উপদলে বিভক্ত এবং পরস্পর ফতোয়াবাজীতে নিমগ্ন মুসলমানগণ আখেরী যুগে চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা থেকে উদ্ধারের জন্য এবং ইসলামের নব–জাগরণের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

'হুরুফে আবজাদ' অনুযায়ী আখেরী যুগের হিসাবঃ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টান্ত

(ক) সুরা মুমেনুন ঃ ১৯

"ওয়া ইন্না আল জেহাবীন বিহি লাক্কাদিরুন"–এর সংখ্যাগত মান ১২৭৪ বছর দ্বারা ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষ অংশকে বুঝায় যার দ্বারা ইমাম মাহদীর যুগ সাব্যস্ত হয়েছে।

(খ) সুরা জুমুয়া ঃ ৪

"ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" আয়াতের সংখ্যাগত মান ১২৭৫ দ্বারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)–এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে ইমাম মাহদী (আঃ)–হিসেবে দাবীকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)–এর মাধ্যমে (বুখারী শরীফে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)।

(গ) সুরা যুখরুফ ঃ ৬৭ এবং ইউসুফ ঃ ১০৮

'কিয়ামত'–এর অকস্মাৎ আগমনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'বাগতাতান' (অর্থাৎ অকস্মাৎ) শব্দের সংখ্যামান দ্বারা ১৪০৭ সালের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যখন থেকে কিয়ামত কালের পূর্বে ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আবির্ভাব হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

হুরুফে আবজাদের হিসাব অনুযায়ী আখেরী যুগ সম্পর্কে বুজুর্গানে–দ্বীনের ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত ঃ

(ক) শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওলীঃ তাঁর বিখ্যাত কাসিদাতে লিখেছেন যে, 'গাইন' এবং রে–এর সংখ্যাগত মান অর্থাৎ ১২০০ বছর পর ইমাম মাহদীর লক্ষণাবলী প্রকাশিত হবে।

(খ) শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দস দেহলবীঃ তিনি 'চেরাগদীন' শব্দের সংখ্যাগত মান অর্থাৎ ১২৬৮ বছর দ্বারা ইমাম মাহদীর আগমনের সময়–কাল নির্ধারণ করেছেন (হুজাজুল কিরামা পৃঃ–৩৯৪)।

(গ) হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী: সুরা যুখরুফ (৪৩ ঃ ৬৭) আয়াতের বরাতে 'সায়াত' বা কিয়ামত প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শব্দ এবং 'বাগতাতান'-এর সংখ্যামান (১৪০৭ হিজরী) থেকে কিয়ামত কালের শুরু সম্পর্কে হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তফসীর ইবনে আরাবী, খন্ড-২, পৃঃ-২১৯-২২০)।

আখেরী যুগে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ইমাম মাহদী ও মসীহ হিসেবে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছেন:

* দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীস প্রসঙ্গে: "কোন কোন হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মসীহ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল উভয়েই প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। মসীহ মাওউদ বা তাঁর কোন খলিফা দামেস্কে যাবেন-এটিই 'ইন্না ঈসা ইয়ানযিলু ইনদা মানারাতি দামেস্ক', হাদীসের অর্থ। কেননা, নাযিল বলা হয় আগন্তুক মুসাফিরকে, যে অন্য দেশ থেকে আসে। এক হাদীসে ব্যবহৃত মাশরেক (প্রাচ্য) শব্দটি এদিকে ঈঙ্গিত করে, তিনি প্রাচ্যের কোন দেশ অর্থাৎ ভারত থেকে সফর করে দামেস্ক নগরীর দিকে যাবেন। আমার হৃদয়ে ইলকা (ঐশী চৈতন্যের সঞ্চার) করা হয়েছে, 'ঈসা ইনদা মানারাতে দামেস্ক' এই শব্দমালা ইঙ্গিত করছে, তাঁর আবির্ভাবের যুগের প্রতি। কেননা, হরফগুলোর সংখ্যামানের দিক থেকে (হুরুফে আবজাদের) যোগফল সেই হিজরী সন দাঁড়ায় যে বছর খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (হামামাতুল বুশরা, পৃঃ ৬৬)

* হযরত মসীহ (আঃ) তাঁর ইজালায়ে আওহাম পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

"আর যেমন 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' এর সংখ্যাও হল ১৩০০, তাহাও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছে"। তিনি অন্যত্র লিখেছেন, অতঃপর যেমন 'ঈসা ইনদা মিনারাতে দামেস্ক' থেকেও ১৪০০ সংখ্যাটি পাওয়া যায় আর এই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মসীহ মাওউদের আগমন হয়েছে" (শাহাদাতুল কুরআন, ৭১ পৃষ্ঠা)।

* 'সূরা আসর'-এর 'সংখ্যামান' দ্বারা আখেরী যুগের সময়কাল চিহ্নিতকরণের দৃষ্টান্ত:

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "খোদাতা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সূরা আসরের অক্ষরের মূল্যায়ন আদম হইতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রকাশ করে। উল্লেখিত সূরার প্রেক্ষিতে যখন এই যুগ পর্যন্ত হিসাব করা হয় তখন জানা যাইবে যে, এখন সপ্তম হাজার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবের প্রেক্ষিতেই আমার জন্ম ষষ্ঠ হাজারে হইয়াছে।" (হাকীকাতুল ওহী)।

* মানবজাতির ষষ্ঠ হাজার-এর শেষাংশে রূপকভাবে আগমনকারী 'আদম' মসীহ নামে অভিহিত ঃ "আদি নিয়ম অনুযায়ী খোদাতা'লা তাঁর পবিত্র নবীদের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, বর্তমান সভ্যতার প্রারম্ভে আগমনকারী আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে গণনা করে যখন ছয় হাজার বছর শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে তখন ভূপৃষ্ঠে বড় অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করবে আর পাপের বন্যা তীব্র গতিতে বয়ে যাবে। আল্লাহর ভালবাসা যখন মানব হৃদয়ে অনেক হ্রাস পাবে বরং নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহতা'লা কোন প্রকার জাগতিক উপকরণ ছাড়া কেবল ঐশী-পন্থায় আধ্যাত্মিকভাবে আদমের অনুরূপ এক ব্যক্তির মাঝে সত্য, প্রেম ও মা'রেফাতের রূহ ফুৎকার করবেন। তাকে মসীহও বলা হবে। কেননা, খোদাতা'লা স্বহস্তে তাঁর আত্মায় নিজস্ব ভালবাসার সুগন্ধি মাখিয়ে দেবেন আর সেই প্রতিশ্রুত মসীহ, যাকে আরেকভাবে খোদার ঐশী গ্রন্থসমূহে মসীহ মাওউদও বলা হয়েছে-তাঁকে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে। আর শয়তানী বাহিনী এবং মসীহ্-এর মাঝে এটাই শেষ যুদ্ধ হবে। সেদিন শয়তান তার সমস্ত শক্তিসহ, সব বংশধরসহ, সর্বপ্রকার পরিকল্পনাসহ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে। ...যত পন্থায় শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে পারে, সেই সব পদ্ধতি সেদিন সহজলভ্য হবে। তখন প্রচন্ড এক যুদ্ধের পর (যা প্রকৃতপক্ষে একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ) খোদার মসীহ বিজয় লাভ করবেন এবং শয়তানী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত খোদার মাহাত্ম্য, মহিমা, পবিত্রতা ও একত্ববাদ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। সেই যুগ পূর্ণ হাজার বছরের হবে, যাকে 'সপ্তম দিবস'ও বলা হয়। এরপর পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে। অতএব, আমিই সেই মসীহ যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক...। কুরআন শরীফ প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর যুগের আরেকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহর একদিন তোমাদের এক হাজার বছরের মত (সুরা হাজ্জ ঃ ৪৮)।...মানব সভ্যতার যে চক্র, তার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে সাতটি দিন ধার্য করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো আদম-সন্তানদের বর্তমান সভ্যতার আয়ু সাত হাজার বছর ধার্যকৃত রয়েছে...সূরাতুল আসর-এ অর্থাৎ এর বর্ণমালার গাণিতিক মানের (আবজাদের) গণনানুযায়ী কুরআন শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ)-এর যুগে যখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন আদমের যুগ থেকে তত সময় অতিবাহিত হয়েছিল যা উল্লেখিত সূরার আবজাদের সংখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান। এই হিসাব অনুযায়ী মানবজাতির আয়ুর মধ্যে এখন এ যুগে ছয় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। শুধু কুরআন শরীফেই নয় বরং তার পূর্বে অবতীর্ণ বেশীর ভাগ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, সর্বশেষ সেই প্রেরিত পুরুষ যে আদমের রূপে আবির্ভূত হবে আর যাঁকে মসীহ নামে সম্বোধন করা হবে-তাঁর জন্য 'ষষ্ঠ হাজার'-এর শেষাংশে জন্ম নেয়া আবশ্যক, যেমন আদম ষষ্ঠ দিনের শেষাংশে জন্ম নিয়েছিলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত নিদর্শন যথেষ্ট।" (লেকচার লাহোর, পৃঃ-৪৩-৪৮)।

বিরুদ্ধবাদীদের জন্য প্রশ্ন হলোঃ আবজাদের হিসাব অনুযায়ী সেই নির্ধারিত যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ব্যতীত অন্য কোন ঐশী প্রতিশ্রুত সত্য দাবীকারকের নাম-পরিচয় কেউ জানাতে পারছেন না কেন ?

[চলবে]

শান্তির আলোক বর্তিকা

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

২০১৮ সালের অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় যুক্ত রাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মসজিদ 'বায়তুল আফিয়া' (নিরাপত্তার ঘর)-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ এক সংবর্ধনা-সভায় তিনি ভাষণ দেন। ফিলাডেলফিয়া শহরে নির্মিত ১ম এই মসজিদটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত, যা আনুষ্ঠানিকভাবে হুযূর (আই.) শুক্রবার দুপুরে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। যাহোক, এ অনুষ্ঠানে যা ১৭৫ জনের অধিক উচ্চ- পদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক পরিচালিত নীরব-দোয়ার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। পরে হুযূর আকদাস (আই.) বেশ কিছু আমন্ত্রিত অতিথির সাথে ব্যক্তিগতভাবেও সাক্ষাৎ করেন। এ অনুষ্ঠানের পূর্বে হুযূর আকদাস (আই.) এর সাথে ফিলাডেলফিয়ার মেয়র জেম্‌স কেনি এবং কংগ্রেস সদস্য ডোয়াইট ইভাসের ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ হয়। এ উপলক্ষ্যে আগত সংবাদ-মাধ্যমের সদস্যদের সাথেও হুযূরের (আই.) সাক্ষাৎ হয় এবং তারা নূতন মসজিদ নির্মাণ ও প্রাসঙ্গিত বিষয় সম্বন্ধে তার নিকট জানতে চান, যে উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হুযূর আকদাসের (আই.)-এর বক্তব্য এখানে পেশ করা হলো।

তাশাহুদ, তাআউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হযরত মির্য মাসরূরর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু' (আপনাদের সকলের ওপর শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক)।

প্রথমেই আমি সমাগত সকল অতিথিকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আজকের এ দিনটি আমাদের জন্য বিশেষ এক আনন্দের দিন, কারণ এই দিনে এ শহরে আমরা নতুন ১টি মসজিদ উদ্বোধন করতে পেরেছি।

জীবনের এটা এক বাস্তবতা যে মানুষ এমন এক সৃষ্টি, যারা সামাজিক যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা ছাড়া বাঁচতে পারে না। ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য থাকা সত্বেও মানুষ হিসাবে আমরা এক। তাই মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ব্যতিত নিজেদেরকে আলাদা করে বা নিজ গন্ডীভূত সমাজের কিছু লোকের সাথে সম্পর্ক রাখলেই আমাদের চলে না।

তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দেয়াল ভেঙ্গে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলা এবং জ্ঞান ও জানাশুনার পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয়। একটি সমাজের উন্নতি ও বিবর্তনের জন্য এবং সমাজে বসবাসকারী সকলের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের আলোচনা একান্ত জরুরী। সেদিক থেকেই আজ আমি ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু সময় ব্যয় করে এখানে আসার বিষয়টি গভীর সম্মানের চোখে দেখি। আপনাদের বেশীর ভাগ অমুসলিম, আর এরূপ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এসেছেন– এ দৃশ্য আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করে। আজ এখানে একটি মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। তাই, সে বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে আমি আপনাদের উচ্চ সহনশীলতা ও সম্মানবোধের প্রশংসা না করে পারছি না।

একথা সত্য যে, আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জামা'তের সদস্যদের সাথে আপনাদের সুসম্পর্ককে তুলে ধরে আর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আপনারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানার আগ্রহ রাখেন। এটা এ সত্যকেই স্পষ্ট করে যে, অন্যের শোনা কথায় আপনারা কর্ণপাত করেন না বা অন্যের দেওয়া তথ্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেও রাজী নন।

আজকের যুগে, যেখানে সঠিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই বহু প্রতিবেদন পরিবেশিত হয়, সেখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত সত্যকে জানার আপনাদের যে আগ্রহ, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম মুসলমান সম্পর্কে, বা ইসলাম-বিরোধীরা কী অর্থে ইসলামকে

তুলে ধরে–তাকেই সত্য না ভেবে আপনারা সরেজমিনে এখানে এসে তার সঠিক বৈশিষ্ট জানতে চান, সেজন্য আনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

আপনারা হয়তো ভালভাবেই জানেন যে, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্লোগান হলো 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়' কারো পরে। এটা নূতন কোন বিষয় নয়, যা আমরা হঠাৎ করেই অবলম্বন করেছি, বরং এটা আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবীজী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুরু থেকেই ইসলাম পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষার কথা বলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমে (৬:১০৯) আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, মুসলমানরা যেন তাদেরকে গালি না দেয়, খোদাকে ছেড়ে যে প্রতিমাগুলোকে তারা উপাস্য হিসেবে ডাকে। কারণ, এতে তারা খোদাকে মন্দ বলাতে বা তাঁর বিরোধিতা করতে প্ররোচিত হতে পারে'। তাই সমাজে উস্কানী ছড়ানো কিংবা ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি যেন না হয়, সেজন্য মুসলমানদেরকে সর্বদা ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাতে ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলা হয়েছে।

অথচ, প্রায়শ: এ অপবাদ দেওয়া হয় যে, মুসলমানরা অন্য ধর্মের সম্মান করে না বা তাদের ধর্মগুরুদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। বস্তুত: সত্যের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। একথা ভালভাবে জেনে রাখুন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে সকল মুসলমান এই কথা মানে যে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির লোককে হেদায়াত ও তাদের সংস্কারের জন্য খোদা বহু নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে সেসব নবীর সত্যতা ও সমসাময়িক যুগের লোকদেরকে খোদামুখী করা এবং তাদের নৈতিকতার মান উন্নয়ন করা এবং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের আগমণে বিশ্বাসী। সেসব মহাপুরুষ বিবেকের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানুষের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কিভাবে অন্য ধর্ম বা তার অনুসারীদের ঘৃণা বা অসম্মান করা সম্ভব?

সুতরাং আমরা আহমদীরা আমাদের এই দাবীতে খুবই আন্তরিক যে আমরা কারো প্রতিই ঘৃণা প্রদর্শন করি না। আর এর বিপরীতে সকলের প্রতি ভালবাসা ও সর্বদা সকলের জন্য বন্ধুত্বের হাতকে প্রসারিত করার ব্যাপারেই আমরা আগ্রহী। যার ছোট্ট একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। গত বছরই ফিলাডেলফিয়ার একটি ইহুদী সমাধি ক্ষেত্র কিছু দুবৃত্ত আক্রমণ করে এবং এর স্মৃতি-ফলকের ব্যাপক ক্ষতি করে। সাথে সাথেই এই জঘন্য এ অপরাধের প্রতিরোধে স্থানীয় আহমদীরা ইহুদীদের সাহায্যকারী হিসাবে শক্ত অবস্থান নেয়। আমরা এর জন্য কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করি না, কারণ এটা আমরা করেছি নিতান্তই ধর্মীয় এক তাগিদে আর তা হলো অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের বিপদে বা প্রয়োজনে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা। কোন ধর্ম বা ধর্ম-মতের পার্থক্য না করে সকল লোকের জীবন যাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সানন্দে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি।

বস্তুনিষ্ঠতা বা নিষ্ঠার সাথে কেউ যদি ইসলামের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে দেখবে যে সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা সর্বদাই ছিল এর অন্যতম কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট । এর বাস্তবায়ন আমরা নবীজী (সা.)-এর মদীনায় জীবন যাপনের জীবনের প্রাক্কালে স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হতে দেখি, যাতে বহুজাতিক একটি সরকার বা সমাজের ভিত্তি (মদীনা সনদ) তিনি রেখে ছিলেন। মক্কায় দীর্ঘদিনের নির্যাতন ও কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি তার সাথী-মুসলমানসহ মদীনায় হিজরত করেন। বেশ কিছু গোত্র ও ধর্ম-নেতার সমন্বয়ে তিনি সেই সনদে এমন উম্মুক্ত ও বিবেকসম্মত একটি চুক্তি করেন, যা ছিল মদীনার বহুজাতিক সরকার পরিচালনার সংবিধানস্বরূপ। এটাতে এই নিশ্চয়তা ছিল যে, মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সদস্যরা সবাই শান্তিতে, নির্বিঘ্নে, নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। যেহেতু সেখানে মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিক-আরব ছিল, তাই তাদের নিজস্ব ধর্মীয়-বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। সেমতে মুসলমানরা তাদের শরিয়া অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় আচরণ, ইহুদীরা তৌরাতের বিধান ও অন্যরা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের ধর্ম পালনের অনুমতি প্রাপ্ত ছিল। নিশ্চিতরূপেই, এটা ছিল সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একই সাথে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই, তারা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন, শান্তি ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত ছিল। তাই সে চুক্তির ফলে সেখানে শান্তি ও একটি সহনশীল সমাজ গঠনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় আগে মদীনার মত একটি বহু সংস্কৃতি ও বিশ্বাস অবলম্বনকারী জনপদে বিস্ময়করভাবে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি একথা বলছি না যে, আজকের সমাজেও তেমনি একটি এলাকায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য বহুজাতিক কোন আইন করা হোক। বরং আমি এটা বুঝাতে চাই যে, একটি সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের লোককে শান্তি, সার্বজনীন মানবিক-মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সুবিচারকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী নবীজী (সা.) পরিস্কারভাবে বলেন, ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ধর্ম মানার ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া যাবে না। কারণ, বিশ্বাস তো কোন একজনের ব্যক্তিগত বিষয়, যা তার হৃদয় ও আত্মার সাথে জড়িত, তাই এটা পছন্দ করার অধিকারও তার নিজস্ব।

তেমনি ইসলামের শিক্ষা এটিও যে, ধর্মীয়-বিশ্বাস যার যাই হোক, একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এটা প্রত্যেকের

দায়িত্ব যে, সকলের কল্যাণের স্বার্থে তাদের শান্তিকামী হতে হবে এবং যা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে, তা থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হবে। ইসলামের শিক্ষা হলো প্রত্যেককে রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে এর অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। অতএব, এ মসজিদ নির্মাণের কারণে যদি আপনাদের কারো মনে সামান্য হলেও এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে এটা সমাজের অন্যদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা বা ঘৃণা সৃষ্টির কোন আখড়া হবে, আমি তাদেরকে আবারও এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এরূপ অমূলক-সন্দেহের কোন কারণ থাকা উচত নয়। আপনারা নিশ্চিত হোন, এটি কখনোই কোন ষড়যন্ত্র নয়, এ মসজিদ থেকে সতত: ভালবাসা, স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বের বাণীই প্রদীপ্ত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

একই সাথে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলের, তারা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন শান্তি ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত ছিল। তাই সে চুক্তির ফলে শান্তি ও সহনশীল একটি সমাজ সাধনের গঠনের দ্বার সেখানে উন্মুক্ত হয়। ফলে, আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও বেশি আগে মদীনার মত একটি বহু সংস্কৃতি ও বিশ্বাস অবলম্বনকারী অঞ্চলে বিস্ময়কর ভাবে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আমি একথা বলছি না যে, আজকের সমাজেও তেমনি বহুজাতিক কোন আইন একটি এলাকায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য করা হোক। বরং আমি এটা বুঝাতে চাই যে, একটি সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের লোককে শান্তি, সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতাও সুবিচারকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী নবীজী (সা.) পরিস্কারভাবে বলেন ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ধর্ম মানার ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া হবে না। কারণ, বিশ্বাস তো একজনের ব্যক্তিগত বিষয়, যা তার হৃদয় ও আত্মার সাথে জড়িত, তাই এটা পছন্দ করার অধিকারও তার নিজের।

তেমনি ইসলামের এ শিক্ষাকেও বুঝানো হয় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস যার যাই হোক, একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এটা প্রত্যেকের দায়িত্ব যে, সকলের কল্যাণের স্বার্থে তাদের শন্তিকামী হতে হবে এবং যা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে, তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। ইসলামের শিক্ষা হলো প্রত্যেককে রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে এর অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। অতএব, এ মসজিদ নির্মাণের কারণে যদি আপনাদের কারো মনে সামান্য হলেও এ সংশয় সৃষ্ট হয় যে এটি সমাজের অন্যদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা বা ঘৃণা সৃষ্টির কোন আখড়া হবে, আমি তাদেরকে আবার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এরূপ অমূলক সন্দেহের কোন কারণ থাকা উচিত নয়। আপনারা নিশ্চিত হোন, কখনো কোন ষড়যন্ত্র নয়, এ মসজিদ থেকে সতত: ভালবাসা, স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বের বাণীই প্রদীপ্ত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

এবারে আমি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। প্রধান উদ্দেশ্য তো এই যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসল্লিরা এক খোদার উপাসনা, যা তিনি শিখিয়েছেন, সেভাবে সম্পাদনের জন্য এখানে সমবেত হবে। এতে পারস্পরিক ভালবাসা ও ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি হবে সাথে সাথে মানুষের সেবার একটি কেন্দ্র হিসাবেও এটি কাজ করবে, যা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বস্তুত: প্রত্যেক ব্যক্তি যে নামাযের জন্য এখানে আসবে, সে সমাজের অন্য সদস্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও দায়িত্বশীল হবে। সেদিক থেকে একটি মসজিদ পরস্পরের মধ্যে সত্যিকার সহনশীলতা, কোমলতা ও ঐক্যের প্রতীক এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্বরূপ। আহমদী মুসলিম সম্প্রায়ের নির্মিত মসজিদ এ সত্যতার সাক্ষী। পৃথিবীর যে অঞ্চলেই এটি নির্মিত হোক না কেন, যেসব সদস্য সেখানে নামায পড়ে, তারা অন্য বুন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে ভালবাসা, সহমর্মিতা ও আনুগত্যের মানদণ্ডকে আরো বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকে। আমাদের মসজিদ আহমদীদের মধ্যে যদি কোন চেতনা সৃষ্টি করে তবে তা জঙ্গীবাদ কিংবা চরমপন্থী কোন কাজ করার জন্যে নয়, বরং তা হলো মানবতার সেবার আবেগ এবং অন্য বন্ধুদের জন্য আমাদের হৃদয়ে আন্তকিতা পোষণ। তাই আমাদের মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং জীবনের সর্বস্তরের লোকের মাঝে পারস্পরিক সদ্ভাব সৃষ্টি করা এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভক্তি দূর করা।

আমি শুনেছি, এই শহর 'ভাইয়ের স্নেহমাখা শহর, বলে খ্যাত। সেদিক থেকে আমাদের নূতন মসজিদ এই ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সদ্ভাবকে এখানে এবং এই এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে দেবার এক দৃঢ় অঙ্গীকার, যা আমরা আমাদের তরফ থেকে ব্যক্ত করেছি। এ ধরনের দাবী করা সহজ, কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে আমাদের কথা কোন হাল্কা তামাসার বিষয় নয়, বরং সত্যিকার ঐতিহাসিক দলিল। সর্বদাই আমরা যা মুখে বলি, তা কাজেও করে দেখাই। তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে এখানকার স্থানীয় জনসাধারণ শীঘ্রই দেখবে, 'বাইতুল আফিয়া' নামের যে মসজিদ আজ এখানে তৈরী হলো, তা শীঘ্রই সমস্ত সমাজের জন্য প্রকৃতই এক নিরাপত্তার গৃহে পরিণত হয়েছে, যা 'বাইতুল আফিয়া' নামের অর্থ।

তদুপরি, আমি স্পষ্টভাবে এটাও জানাচ্ছি যে শান্তি ও মানব-সেবার জন্য আমাদের যে দাবী, এমন প্রত্যয় আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষার কারণে লাভ করেছি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) অর্থাৎ 'হেদায়াপ্রাপ্ত' ঐশী-পুরুষ বলে বিশ্বাস করি, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নবীজীর (সা.) মসীহা হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন, আর তিনি মূসায়ী মসীহা [অর্থাৎ ঈসা (আ.)]-এর মত শান্তিপূর্ণ পন্থায় তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।

তিনি একথাও বলেছেন যে, দুইটি অনন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাশক্তিমান খোদা কর্তৃক তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

প্রথমত: তিনি এজন্য প্রত্যাদিষ্ট যে, মানুষকে খোদামুখী করা এবং খোদার অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দ্বিতীয়ত: তার আসার অন্যতম কারণ হলো মানবতার প্রতি সম্মান ও পারস্পরিক মূল্যবোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাই প্রত্যেক আহমদী, যারা তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য এটা জরুরী, যেন খোদার নৈকট্য লাভ এবং মানুষের সেবার জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগকে কাজে লাগায়। এই বিষয়টির প্রতিই কুরআন শরীফের সূরা নিসায় (৪:৩) বারবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং নবীজী (সা.)-ও এর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তা বিশ্বাসীদের শিখিয়েছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীরা তোমরা এক খোদার উপাসনা কর, এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম মিসকিনের প্রতি তোমরা সদয় হও। প্রতিবেশী (আত্মীয় বা অনাত্মীয়), তোমাদের সহচর, পথচারী এবং অধীনস্থ দাস-দাসী বা কর্মচারীর প্রতিও দয়া করা। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদেরকে খোদা ভালবাসেন না। (৪:৩৭)।

কুরআন শরীফের শুধু এই একটি আয়াতই মানুষের নৈতিকতা ও মানবাধিকার রক্ষার অনন্য-সনদ বলে সাব্যস্ত হতে পারে। শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিস্তারের এটি একটি স্বর্ণালী পথ। এই আয়াতে খোদা তাঁর উপাসনা করার পরই মুসলমানদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি সদাচরণের আদেশ দেন এবং এরপরই সমাজের সবচেয়ে সুবিধা-বঞ্চিত ও ঝুঁকি-প্রবণ যে জনগোষ্ঠী, যেমন এতীম মিসকিন ও অসহায় লোকদের সহায়তা ও আরাম প্রদানের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেন। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের দিকে আলাদাভাবে সহানুভূতিশীল থাকার কথা বলেন- তারা আত্মীয় বা অনাত্মীয়, যাই হোক। প্রতিবেশীকে ভালবাসা ও নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে মুসলমানরা যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে, সেই তাগিদও এখানে প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ, এটা খুবই সুদূর- প্রসারী এক পরিধিকে ব্যক্ত করে। তাই, আপনার চারপাশে যারা বসবাস করে শুধু তারাই প্রতিবেশী নয়, বরং যারা দূরে থাকে কিন্তু আপনার সহকর্মী, সফরের সাথী, অধীনস্থ এবং অনুরূপ আরো অনেকে, তারাও এর আওতাভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, কুরআনের বর্ণনা মতে, মুসলমানদের কোন শহরে বসবাসকারী সবাই তাদের প্রতিবেশী। নবীজী (সা.)-ও তাই বারবার প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছেন। প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার ব্যাপারে খোদা তার মাধ্যমে এতটা গুরুত্ব দিতে থাকেন যে, তার এক সময় এই ধারণা জন্মে যে, কারো প্রতিবেশী না তার সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারীই হয়ে যায়। সুতরাং আপনাদের এলাকায় আমাদের মসজিদ নির্মাণকে সেই প্রতিবেশীসুলভ দৃষ্টিতে দেখুন। ফিলাডেলফিয়ার এই মসজিদ আহমদী মুসলমানরা তৈরী করেছে, আর আপনারা তার প্রতিবেশী। এর মাধ্যমে এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধান করা এবং এই শহরের লোকদের সেবা করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

তাই, এই মসজিদ এখন উন্মুক্ত হলো, আর স্থানীয় আহমদীদের প্রতিবেশীর প্রতি কর্ণপাত করার দায়িত্বও বেড়ে গেল। এই শহরের সকল লোক এখন তাদের প্রতিবেশী এবং আপনাদের অধিকার প্রদানের জন্য তাদের সম্ভাব্য শক্তি দিয়ে তারা জোর প্রচেষ্টা চালাবে। আপনাদের যেকোন প্রয়োজন কষ্ট ও উৎকণ্ঠায় তারা আপনাদের পাশে থাকবে। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর হতাশা ও কষ্টের অশ্রু মোচন ও তাদের যন্ত্রণায় সহায়তা ও আরাম প্রদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

তাই আমি নিশ্চিত, অচিরেই আপনারা নিজেরাই দেখবেন, এই মসজিদ বাহ্যিক দিক থেকেও যেমন এই শহরের বাড়তি আকর্ষণ, তার চেয়েও বেশী উজ্জ্বল হবে এর আধ্যাত্মিক প্রভাব, যা হবে নিকট ও দূরের মানুষের মধ্যে প্রীতি ও দয়ার বাণী বিস্তারের এক কেন্দ্রস্থল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিকামী সকল মানুষের মধ্যে তা হবে এক আলোক বর্তিকা, শান্তি ও আশার-দিশারী।

একথা বলে, আমি এই আশা ও দোয়া রাখি যে, এ শহরের সবাই, তা যে যেধর্ম ও গোত্রেরই হোক, এক সাধারণ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে, যাতে এক স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হয়। বলা হয়ে থাকে যে, ঔপনিবেশিক আমেরিকার মধ্যে ফিলাডেলফিয়াই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করে। তাই, এর রয়েছে গর্বিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, এবং আমি নিশ্চিত, আপনারা সেই সমৃদ্ধ-অতীতের ওপর নতুন ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরীতে এগিয়ে আসবেন।

আমি এ দোয়া করি, এই শহর যেন সর্বদাই ধর্মীয়-স্বাধীনতা রক্ষার পথ-প্রদর্শক হয়। শুধু এই শহরে নয় বরং এর অধিবাসীরা পুরো দেশে, এমনকি সারা বিশ্বে শান্তি বিস্তারে তাদের ভূমিকা রাখুক। যদিও এখানকার আহমদীরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হবে আমাদের বৃহত্তর জামা'ত এরূপ মহৎ কাজে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত রাখবে। বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় খোদা আমাদের সকলকে সক্ষম করুন। পুনরায় আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল আপনাদের সবার জন্য। খোদা আপনাদের কৃপা করুন। ধন্যবাদ।

অনুবাদ:
অধ্যাপক (অব.) মোহাম্মদ আমীর হোসেন

‘মেহেদী উৎসব’ সম্পর্কে যুগ-খলীফার তাজা দিকনির্দেশনা

প্রশ্নকর্তা: আসসালামু আলাইকুম। হুযূর, আপনি বলেছিলেন যে, আমাদের জামাতে মেহেদী উৎসবের মত যেসব রীতি-রেওয়াজ রয়েছে যেখানে ছেলেমেয়ে একসাথে বসে এবং যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে থাকে, আপনি আহমদীয়াতে এসব নিষেধ করেছেন কেন অর্থাৎ এমন কোন প্রথা যেন আমরা পালন না করি?

হুযূর (আই.): (হুযূর একটু শব্দ করে হেসে উঠে বলেন,) বিষয়টি হল ইসলামে আছে যে, এমন জিনিস যা কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, লোক দেখানো হয়, লৌকিকতাপূর্ণ যাতে ধর্মের কোন বালাই নেই বরং অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে আর এসব রীতি-রেওয়াজ হল বিদআত যা পালন করা উচিত নয়। ঠিক আছে? এগুলো ধর্মের মাঝে এমন সংযুক্তি যা এর দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে। ঠিক আছে? মহানবী (সা.)-এর যুগে তো এমনটি হতো, লোকেদের ইচ্ছা জাগত যে, মহানবী (সা.) তাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তিনি (সা.) উপস্থিত হতে পারতেন না। অনেক বিখ্যাত সাহাবী তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল।

একবার এক সাহাবী আসলেন যিনি যুবক ছিলেন। মহানবী (সা.) দেখলেন যে, তার কাপড়ে হলুদ রঙের দাগ লেগে আছে। পরক্ষণে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তিনি উত্তর দিলেন, গতকাল আমার বিয়ে হয়েছে। এটি তারই নিশানা। মহানবী (সা.) বললেন, খুব ভাল কথা। তারপর তিনি (সা.) বললেন, দাওয়াতে ওলীমা করেছ নাকি করো নি? কম জিনিস দিয়েই করো কিন্তু দাওয়াতে ওলীমা হওয়া উচিত। ইসলামে যে জিনিসের আদেশ, অনুমতি, ঘোষণা রয়েছে তা হল, বিয়ের এলান আর সেখানে তোমরা যতখুশি দাওয়াত করতে চাও করো। অতঃপর এই দাওয়াতের জন্য সবচেয়ে বড় আদেশ যা আসল নির্দেশ তা হল, দাওয়াতে ওলীমা যার প্রতি মহানবী (সা.) জোর দিয়েছেন। সেখানে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ডাক এবং দাওয়াত করো। সবাই সবার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পার করো। মেহেদী-টেহেদী দেয়ার কথা তো ইসলামের কোথাও লেখা নেই। আর ছেলেদের তো কোন কাজও নেই। মেহেদী যদি লাগাতেই হয় তবে কনে পক্ষের তথা নতুন বউয়ের লাগানো উচিত, তাই না। বরকে মেহেদী লাগিয়ে বউ বানাতে চাও না তো! হ্যাঁ, তাই তো।

আমি নিষেধ করি নি মেহেদী লাগাতে। বরং আমি এটি নিষেধ করেছি যে, লোকেরা মেহেদী লাগানোকে এমন রীতি বানিয়ে ফেলেছে যে, এ উদ্দেশ্যে বড় বড় দাওয়াতের আয়োজন করে থাকে। নতুন বউয়ের কিছু স্বাদ-আহ্লাদ থাকে, ঠিক আছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও হয়ে থাকে। নির্দ্বিধায় শাদীর এক দিন পূর্বে মেহেদী উৎসব করো। কিন্তু সেখানে কনের যারা একেবারে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে তারা আসুক, কনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনেরা আসুক। যদি বংশ এমন বড় হয় যে, ঘরে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় তবে ছোট হলরুমে ফাংশন করতে পার যেখানে সবাই একত্রিত হতে পার কিন্তু এটি নয় যে, দূরবর্তী বন্ধু-বান্ধব, আশপাশের অজস্র লোকজন, এলাকাসুদ্ধ সব লোকজন নিয়ে একত্রিত হবে। এছাড়া নিকটবর্তী শহরে যেসব লোক আছে তাদেরক ডাকবে এই বলে যে, আস আমার মেহেদী উৎসব হচ্ছে– এসব অপব্যয়। এরকম হওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে? ইসলাম কোথাও এসব বলে নি।

এছাড়া যা দেখা যায় যে, ছোট পরিসরে মেহেদী উৎসব করা হয় যেখানে কনে বসে থাকে আর ছোট ঢোলকীও বাজানো হয়, বিয়ের শালীন গান গাওয়া হয় কিন্তু এমন গান গাও যেখানে শিরক না থাকে। ভারতীয় অনেক এমন গান রয়েছে যেখানে শিরক রয়েছে, দেবী-দেবতাদের নাম নেয়া হয়- তা গাওয়া উচিত নয়। দোয়াভরা নযম পড়, দোয়াপূর্ণ এমন অনেক পবিত্র পংক্তি মিশ্রিত গান রয়েছে বরং আহমদী মেয়েদের তো এমন গানও লেখা উচিত। তোমাদের উর্দু জানা না থাকলে ইংরেজীতে এমন বিয়ের গান রচনা কর, নিঃসন্দেহে সেসব গান গাও, কোন আপত্তি নেই। ঠিক আছে?

আমি এটি বলছি না যে, সোজা উঠে গিয়ে বস আর তোমাদের মনে এমন হতাশা সৃষ্টি হোক যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারছো না। এগুলোর জন্য একটি মাত্রা নির্ধারিত থাকা উচিত। সেই সীমার মধ্যে থাক এবং যা খুশি করো। ঠিক আছে? নারীর অনেক মূল্যবান একটি অলঙ্কার হল লজ্জা। লজ্জাকে সুরক্ষিত

করো। ঐ মেয়েটি বলল না যে, কনে এভাবেই এসে যায়, এর অর্থ হল, সেই কনের মাঝে লজ্জা নেই। বুঝেছ? লজ্জা সর্বদা নারীদের সম্মান বৃদ্ধি করে। ঠিক তো না-কি? খ্রিষ্টান মহিলারা পূর্বে অনেক বেশি লজ্জাশীল ছিল। কাপড় লম্বা লম্বা হতো আর যারা বংশীয় ঘরের মেয়ে হতো তাদের পোশাক আরো ভাল হতো। হাতাঢাকা পোশাক এবং স্কার্ফ পরতো। এরা তো ধীরে ধীরে নারীর স্বাধীনতার নামে বরং ইংল্যাণ্ডে একজন খ্রিষ্টান মহিলা একটি আর্টিকেল লিখেছে যে, পুরুষেরা যে বলে নারীদের স্বাধীনতা দাও, এটি দাও, ওটি দাও, পর্দা সরিয়ে ফেল, তাদের পোশাক উলঙ্গ করে দাও। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীর স্বাধীনতা চায় না বরং নিজেদের যেসব কামনা-বাসনা আছে সেগুলো পূরণ করতে চায়। তিনি আরো বলেন, মহিলারা তাদের কাছে অর্থাৎ পুরুষের নিকট বোকা বনে যায়। এজন্য নারীদের যে লজ্জা আর আহমদী মহিলাদের আরো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যবান হওয়া উচিত, এদিকে মনোযোগ দাও। এছাড়া ছেলেদের জন্যও অনেকে মেহেদী করে থাকে। তারা পাঁচদিন ব্যাপী শুধু মেহেদীর দাওয়াত করে থাকে তা একেবারেই বাজে খরচ।

তোমরা একটু চিন্তা করো! আমেরিকায়, পাকিস্তানে এমন অনেক গরীব মেয়ে আছে যাদের কাছে বিয়ের জন্য এক জোড়া চুড়িও নেই। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেছেন, তোমরা অন্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো, অন্যদের প্রতি খেয়াল রাখ। এতই যদি টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় তবে তাদেরকে দাও। তোমরা যদি ৫০০ ডলার ৩য় বিশ্বের কোন গরীব মেয়ের বিয়ের জন্য দাও তবে এতে পাকিস্তানে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হয়ে যায়, যা দিয়ে ছোট-খাট একটি বিয়ে হয়ে যায়। সেখানে তো তারা একটি তরকারীই খাওয়াতে পারে না আর তোমরা এখানে এত দাওয়াত করছ যে, খাবারই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরাও যদি এগুলো করি তাহলে আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কী থাকল? পশ্চিমা যত দেশ রয়েছে সেগুলোর তাকিয়ে দেখ, সেখানে কত ধনী ব্যক্তি আছে? দেশও ধনী, পয়সা আছে, লোকদের কাছেও আছে অর্থাৎ, সরকারেরও আছে আবার লেঅকদের কাছেও পর্যাপ্ত আছে। এরা বলেও যে, আমরা ৩য় বিশ্বের মানুষদের সাহায্যও করে থাকি। তারাও কেবল সেখানে পয়সা বিলায় যেখানে তাদের স্বার্থ আছে। আর তাদের কেবল অল্পই দিয়ে থাকে যে, খাও আর বেঁচে থাক। অথচ পৃথিবীতে ক্ষুধা মিটানোর জন্য আমেরিকা, কানাডায় এত উৎপাদন হয় যে তারা অতিরিক্ত দ্রব্যাদি মাঝেমধ্যে সমুদ্রে তা ফেলে দেয়। এগুলো তারা গরীবদের দিতে পারে। ইউরোপে, হল্যাণ্ডে দুগ্ধসামগ্রী এত পরিমাণে হয় যে, তারা এসব নষ্ট করে দেয় অথচ এগুলো গরীবদের দেয়া যেতে পারে। যাইহোক তোমাদের রীতি-নীতি আর মেহেদী লাগানোর পিছনে লেগে থাকার পরিবর্তে গরীবদের খেয়াল রাখা উচিত। ঠিক আছে? বুঝেছ?

প্রশ্নকর্তা: জাযাকাল্লাহ্।

দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=7qw6pgYDZe4

ইশায়াত দপ্তর বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত

জলসার উদ্দেশ্য ও পালনীয় জরুরী বিষয়সমূহ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক গত ৩০ আগস্ট, ২০১৩ এবং ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তরিখ জুমুআর খুতবায় প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে

- জলসা মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট করে তাই জলসায় যোগদান করা উচিত।
- মেহমানদারী আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়, এ বিষয়ে সকলকে বিশেষ মনযোগী হওয়া উচিত।
- নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রত্যেক সদস্যের সহযোগিতা করা উচিত। জলসায় আগমনকারী প্রত্যেকের নিজের আশে-পাশে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।
- জলসায় প্রদত্ত বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত মনযোগ সহকারে প্রত্যেক সদস্যের শ্রবণ করা উচিত এবং সেই পরিবেশের জন্য পূর্ব থেকেই চেষ্টা করা দরকার।
- অযথা নারা দেওয়া উচিত নয়। বরং মনযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করা উচিত।
- নামাযের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই সঠিক সময়ে অবশ্যই প্রত্যেকের নামাযে উপস্থিত হওয়া উচিত।
- কর্মীগণের আন্তরিকতা, পরিশ্রম এবং সর্বদা হাসি মুখে কাজ করা উচিত।
- জাগতিকভাবে অনেক বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন কিন্তু জলসায় এসে মাটিতে ঘুমাচ্ছেন, ছোট থেকে ছোট কাজ করছেন তা দেখে অন্যরা প্রভাবিত হয়েছে। তাই আমাদের মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।
- পর্দা কখনো মহিলাদের সম্মানকে খাটো করে না বা অধিকার খর্ব করে না। যদি এটা দেখতে হয় তাহলে আহমদীদের পরিবেশে দেখুন। আমাদের মাঝে এ চিত্র ফুটে উঠা উচিত।
- লাজনা সদস্যাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ নিজেদের করা উচিত।
- হুযূর (আই.)-এর খুতবা অ-আহমদীদেরও প্রভাবান্বিত করেছে তাই আহমদীদের কোন অবস্থাতেই খুতবা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।
- জলসায় আগমনের দুটি উদ্দেশ্য (১) আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক ও তরবিয়তের উন্নতি করা (২) ব্যবস্থাপনাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা।
- সর্বদা একে অপরের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা উচিত, কেননা এতে বড় পুণ্য নিহিত।
- জলসার পরিবেশকে পবিত্র ও আনন্দময় করে তোলা প্রত্যেকের দায়িত্ব।
- সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ করে জলসার দিন গুলোতে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

(৪র্থ কিস্তি)

৪। **রাষ্ট্রীয় জীবন।**

মানব জীবন রাষ্ট্র নামক একটি প্রতিষ্ঠানের শাসনাধীনে চলে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আবার একটি শাসন পদ্ধতি আছে। রাষ্ট্র যার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় তিনি একটি শাসন কাঠামোর সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যে প্রক্রিয়ায় এই কাঠামো রাষ্ট্র পরিচালনা বা শাসন করে তাই-ই রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। এই বিভাগ দুভাগে বিভক্ত। প্রশাসনিক বিভাগ ও অন্যান্য কার্যক্রমিক বিভাগ। প্রশাসনিক বিভাগে আছে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন। এরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত। অন্যান্য বিভাগ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন বিচার বিভাগ, কৃষিবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, খাদ্য বিভাগ ইত্যাদি। এসব বিভাগ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়। সকল মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির আওতাধীন।

কীভাবে রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো গঠিত হয়, তার গঠনপ্রণালী কীরূপ তার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন যে ইসলামী রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো ও অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো ভিন্নতর। জেনে রাখা ভাল যে, যারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন তারাই এই কাঠামোর সদস্য। যেমন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট, রাজা বা বাদশাহ, মন্ত্রি পরিষদ, পার্লামেন্টের সদস্যগণ বা আইন পরিষদ।

দু' প্রকার শাসন কাঠামোই বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রথমে অন্যবিধ রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন পদ্ধতির উপর আলোচনা করা যাচ্ছে।

অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো দু'ভাগে বিভক্ত। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। উভয় তন্ত্রেই একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকে। রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে রাজা বা বাদশাহ বলা হয়। রাজ্য বড় হলে তাকে সম্রাট বলা হয়ে থাকে। আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নামে আখ্যায়িত।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রই হোক বা প্রজাতন্ত্র, কোথাও একজন বা কোথাও দু'জন রাষ্ট্র বা রাজ্য পরিচালনা করেন, এদের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান বলে। তাদের দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। তাদের মধ্যে যেখানে একজন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তিনি একাধারে রাষ্ট্র প্রধান আবার সরকার প্রধানও। দুজন রাষ্ট্র পরিচালক থাকলে রাষ্ট্র প্রধানকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধানকে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী। একজন দ্বারা পরিচালিত প্রজাতন্ত্রের পরিচালককে বলা হয় প্রেসিডেন্ট এবং রাজতন্ত্রের প্রধানকে রাজা বা বাদশাহ বলা হয়। একজন দ্বারা শাসিতরাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রে কোন প্রধানমন্ত্রী থাকে না। রাজতন্ত্রে দুজন রাষ্ট্র পরিচালকের রাষ্ট্র প্রধানকে রাজা আর সরকার প্রধান প্রজাতন্ত্রের ন্যায় প্রধান মন্ত্রি নামেই আখ্যায়িত।

দুজন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ও রাজ্যের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য। একজন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ও রাজ্যের দৃষ্টান্ত যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব।

রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই সরকার প্রধান মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলে মন্ত্রী পরিষদ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে তা রাষ্ট্রপ্রধানের (তিনি রাজা হোন বা রাষ্ট্রপতি) অনুমোদন ও স্বাক্ষরের পর কার্যকর করা হয়। প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজতন্ত্রে রাজা বা বাদশাহ একবার রাজা বা বাদশাহ হলে কোন বিঘ্ন না ঘটলে তিনি আমৃত্যু বংশ পরম্পরায় রাজ্য শাসন করেন। রাজতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রির ন্যায় এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নির্বাচিত হন।

সরকার প্রধান পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদের সাহায্যে রাষ্ট্র বা রাজ্য শাসন করেন। কোন ক্ষেত্রে একে কংগ্রেসও বলে। প্রত্যেক রাষ্ট্র বা রাজ্য পরিচালনার জন্য সংবিধান বা গঠনতন্ত্র থাকে। তাতে

আইনের বিভিন্ন ধারা সন্নিবেশিত থাকে, যার সাহায্যে রাজ্য শাসিত হয়। এই গঠনতন্ত্র আইন পরিষদ দ্বারা প্রণীত হয়। আইন পরিষদ মনে করলে সংশোধনী এনে কোন ধারা সংশোধন করতে পারে। আইন পরিষদ মনে করলে কোন নূতন ধারা সংযোজনও করতে পারে। আইন প্রণয়ন করে জন্য এ পরিষদের নাম আইন পরিষদ।

আইন পরিষদের সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনার দ্বারা গঠিত। যারা আইন পরিষদের সদস্য হতে চান তারা দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে বা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন কমিশনে লিখিতভাবে আবেদন করেন। নির্বাচন কমিশন যাচাই বাছাই এর পর যাদের আবেদন মঞ্জুরের পর প্রতীক বরাদ্দ করেন তখন তারা প্রচার প্রচারণায় নামেন। এক বা একাধিক নির্ধারিত দিনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়। নির্বাচন কর্মকর্তারা এই ভোট গ্রহণ কার্যপরিচালনা করেন। ভোটে গণনার পর যিনি বেশী ভোট পান, নির্বাচন কমিশন তাকে পার্লামেন্টের সদস্য (এম.পি) বলে ঘোষণা দেন। এভাবে একজন আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রকাশ থাকে যে, আইন পরিষদে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার থাকেন। তাদের মাধ্যমে আইন পরিষদ পরিচালিত হয়।

প্রজাতন্ত্রে যেখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হন, সেখানে তারা উভয়ই পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি থাকে, যাকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়, তিনি জনগণ ও অন্য একটি সংগঠনের (যার নাম আমার স্মরণ নেই) ভোটে নির্বাচিত হন। জনগণের ভোট পেলেও সংগঠনের ভোট বেশী পেলে তিনিই প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষিত হন, যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জনগণের ভোট কম পেলেও সংগঠনের ভোট বেশী পাওয়ায় তাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করা হয়।

এখন ইসলামী রাষ্ট্র শাসন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ইসলামী রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি বা রাষ্ট্র শাসন কাঠামোয় যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁকে খলীফা বলা হয়। তিনি রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান উভয় দায়িত্বই পালন করেন। ইসলামের প্রাথমিক রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। হযরত রসূলে করীম (সা:) এই শাসন পদ্ধতি কায়েম করেন। নবী হিসেবে তিনি প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন। তাঁর সময় আরবে কোন রাষ্ট্র কাঠামো ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এসে পরে। তিনি আরবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর মৃত্যুর পর ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য হযরত রসূলে করীম (সা:) এর প্রতিনিধিরূপে হযরত আবুবকর (রা:) নির্বাচিত হন। নবীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কুরআন তাঁকে খলীফা নাম প্রদান করে। (২৪:৫৬) রাষ্ট্রশাসন যদি নাও থাকত তবুও তিনি খলীফারূপে ইসলামের নেতৃত্ব দিতেন। এজন্যই ইসলামের খলীফাদের আমিরুল মুমেনিন ও খলীফাতুল মুসলেমীন বলা হত। তৎকালীন নবগঠিত এই ইসলামিক রাষ্ট্রে ইহুদী খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোকও বাস করত। অতএব তখনকার ইসলামিক রাষ্ট্রের খলীফা তাদেরও খলীফা ছিলেন। রাষ্ট্রের এসব ধর্মের লোকদের বাদ দিয়ে শুধু মুসলমানদের খলীফা বলায় সহজেই অনুমেয় যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রধানের খলীফা পদবী ধর্মীয় নেতৃত্বের কারণেই।

এখন ইসলামী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের খলীফাগণ যদিও নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত হতেন, কিন্তু সে নির্বাচন অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় নির্বাচনের মত ছিল না। সে নির্বাচনে কেউ পদ প্রার্থনা করতে পারতেন না বা কোন প্রচার প্রচারণাও হতোনা। নির্বাচনকালে উপস্থিত জনগণের নির্ধারিত একজনের প্রস্তাবে ও অন্যদের সমর্থনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। খলীফা নির্বাচনের পর উপস্থিত সকলে নব নির্বাচিত খলীফার হাতে বায়আত নিতেন। পরে অন্যরাও তার নিকট বায়আত নিতেন। (বুখারী- কিতাবুল আহকাম)

এই খিলাফতের কোন মন্ত্রী পরিষদ বা আইন পরিষদ ছিলনা। মজলিশে সূরার (পরামর্শ সভা) পরামর্শে রাষ্ট্র শাসিত হত।

বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্র থাকলেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম নেই। তবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্মীয় খিলাফত বর্তমান। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এই খিলাফত খিলাফতে আলা মিনহাজেন নাবুয়াত রূপে প্রতিষ্ঠিত, যা তার অনুসারীদের ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে এই খিলাফতের পঞ্চম খিলাফতের কাল চলছে।

বর্তমান খিলাফতের খলীফাদেরকেও আমীরুল মুমেনিন, খলীফাতুল মুসলেমীন বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের খিলাফত যেমন খিলাফতে আলামিন হাজিন নাবুয়াত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমান খিলাফতও ঐ একই রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাই খিলাফত হিসেবে দু' খিলাফতের ভেতর কোন পার্থক্য নেই, তবে প্রভেদ এই যে, পূর্বের খিলাফতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল, বর্তমান নেই।

ইসলামে কীভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর আলোকপাত করা যাক।

কোন সংগঠনই নেতৃত্বহীন থাকতে পারেনা। যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একজন রাষ্ট্র প্রধান থাকে, প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা থাকে, প্রত্যেক পরিবারে একজন পরিবার প্রধান থাকে, তদ্রুপ যেহেতু ইসলাম একটি ধর্ম, মুসলিম একটি জাতি, তাই জাতি হিসেবে তারও একজন নেতার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তাই তাঁর পাক কালামে মুসলমানদের সাথে এই নেতা সৃষ্টির অঙ্গীকার করেছিলেন যাকে তিনি খলীফা বলেছেন। যখন হযরত রসূলে করীম (সা:) এর মৃত্যুর পর মুসলমাগণ দিশেহারা হয়ে পরে, তখন আল্লাহর (২৪:৫৬) আয়াতের নির্দেশে তাদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য হযরত আবু বকর (রা:) হযরত রসূলে করীম (সা:) এর প্রতিনিধিরূপে খিলাফতের হাতল ধরেন। নেতৃত্বলাভ করায় মুসলমানগণ নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে সুসংগঠিত হয়। উপরের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতি অবস্থার পর তাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন।" (২৪:৫৬)

হযরত আবুবকরের খিলাফতে আসিন এই ভবিষ্যদ্বানীরই ফল। তাঁর খিলাফতের আসীনের পরই মুসলমানগণ ভয়ভীতি হতে রক্ষা পায়।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, "যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন।" আয়াতের একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। পূর্ববর্তীগণের বলতে সম্ভবত ইহুদী খ্রীষ্টানদের বোঝাচ্ছে। কেননা তাদের মধ্যেই যেকোনভাবে হোক খিলাফত বিদ্যমান ছিল। হযরত মূসা (আ:) তওরাত নিয়ে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধারাবাহিকভাবে এক নবীর মৃত্যুর পর আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধিরূপে (খলীফা) তওরাত দ্বারা ধর্মীয় ফয়সালা করতেন। (৩:৪৫) এক হাদীসেও এরূপ বর্ণনাই আছে। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে এক নবীর মৃত্যুর পর অন্য এক নবী তাঁর খলীফা রূপে আসতেন। (বুখারী) পরে নবীদের সাথে ইহুদীদের দুর্ব্যবহার ও নবীদের হত্যার অপচেষ্টা চালানোর কারণে নবুয়তের ধারা বনী ইস্রাঈলদের ভেতর হতে পরিবর্তীত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর অপর পুত্র হযরত ঈসমাইল (আ:) এর বংশে আসে। আবার ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হলেও তাদের ভেতর পোপ নামে এক প্রকার খিলাফত সৃষ্টি হয় যা এখন পর্যন্ত চলে আসছে। অর্থাৎ আয়াতটিতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে হযরত রসূলে করীম (সা:) এর পর সৃষ্ট খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। হযরত রসূলে করীম (সা:) নবী ছিলেন জন্য তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে খিলাফতে আলামিন হাজিন নাবুয়াত বা নবুয়াতের পদ্ধতিকে খিলাফত বলা হয়েছে। একই হাদীসে প্রথম খিলাফতের শেষের দিকে যখন অরাজকতার রাজত্ব কায়েম হবে তখন আবার নবুয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে বলা হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সা:) এরপর পূনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে বলায় সহজেই বোঝা যায় যে হযরত রসূলে কারীম (সা:) এর পর ইসলামে যখন প্রথম খিলাফতের নিবু নিবু অবস্থা, তখনই আল্লাহ হযরত ইমাম মাহদী (আ:) কে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান। তিনি এসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর উপরের হাদীসের মর্মানুযায়ী খিলাফতে আলামিন হাজিন নাবুয়তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নবী হবেন জন্যই তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে খিলাফতে আলামিন হাজিন নবুয়াত বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসের মর্মানুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ:) নবী হবেন। এভাবে খিলাফতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কেননা হযরত ইমাম মাহদী (আ:) এর খিলাফতও হযরত মোহাম্মদ (স.) এর খিলাফতেরই অংশ। নবী না আসলে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? যেমন হযরত রসূলে করীম (সা:) নবী ছিলেন জন্য তাঁর পরবর্তী খিলাফতকে নবুয়ত পদ্ধতিতে খিলাফত বলা হয়েছে। (পূর্বে উল্লেখিত) এ হাদীসও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পর নবীর আগমনের ঘোষণা দিচ্ছে।

উল্লেখ্য পূর্বের খিলাফতের নিবু নিবু অবস্থার সময় এবং তা তুরস্কের নেতা কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্কের দ্বারা উচ্ছেদের পূর্বেই আহমদীয়া জামাতের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অন্যান্য মুসলমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খিলাফতকে অস্বীকার করায় তারা খিলাফতবিহীন। তাই তাঁরা কান্ডারী বিহীন অবস্থায় দিশেহারা।

বর্তমান খিলাফতে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা না থাকলেও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির কার্যক্রমের ন্যায় বর্তমান খিলাফত বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর ন্যায় এই খিলাফতেরও একটি ধর্মীয় সাংগঠনিক কাঠামো আছে। যার প্রধান হলেন খলীফা। যে সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আছে, সেখানে খিলাফতের আওতাধীন দেশীয় ও প্রাদেশিক জামাত আছে। যার প্রধানকে আমীর বলা হয়। দেশের বা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জামাতের শাখা আছে।

যাদের স্থানীয় জামাত বলা হয়। এসব স্থানীয় জামাতের প্রধানদের বড় জামাত (৪০ জনের বেশী চাঁদাদাতা সদস্য) হলে আমীর ও ছোট জামাত হলে প্রেসিডেন্ট বলা হয়। জামাতের কার্যক্রম কার্যের নামানুসারে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। যেমন তবলীগী কার্যক্রমের জন্য তবলীগ বিভাগ, পুস্তক পুস্তিকা, পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রকাশনা বিভাগ, অর্থ বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য অর্থ বিভাগ, তালীম তরবীয়ত কার্যক্রমের জন্য তালীম তরবীয়ত বিভাগ ইত্যাদি।

এসব বিভাগ যাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের সেক্রেটারী বলা হয়। সকল সেক্রেটারীর উপর একজন জেনারেল সেক্রেটারী থাকেন যিনি আমীর বা প্রেসিডেন্টদের দাপ্তরিক কাজ করেন। কেন্দ্রীয়সহ অনেক জামাতেই নিজস্ব সহায় সম্পদ থাকে। যায়েদাদ বিভাগ এসবের দেখাশুনা করে। এ বিভাগের সেক্রেটারীকে সেক্রেটারী যায়েদাদ বলে।

খিলাফত হতে স্থানীয় জামাত পর্যন্ত এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এজন্য সব স্তরেই নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খিলাফত ও এমারতে বিভিন্ন পৃথক দপ্তর আছে। রাবওয়ায় বিভিন্ন দাপ্তরিক বিল্ডিং দেখেছি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা না হলেও খিলাফত ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

এখন বর্তমান খিলাফতের সাংগঠনিক কাঠামোর গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

এই খিলাফতের প্রথম দু' খলীফার নির্বাচন ইসলামের প্রাথমিক যুগের নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) এতে সামান্য পরিবর্তন আনেন। বর্তমানে জামাতের খলীফা নির্বাচন একটি নির্বাচনী বোর্ডের মাধ্যমে (মজলিসে ইন্তেখাব) অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের একজন প্রেসিডেন্ট থাকেন। তিনি নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নির্বাচন বিধিমালা পূর্বের মতই। এখানেও কেউ কোন প্রচারণা করতে পারেন না বা কেউ পদপ্রার্থীও হতে পারেন না। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নয়, প্রকাশ্যে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বোর্ডের সদস্যদের কেউ দাঁড়িয়ে একজনের নাম প্রস্তাব করেন। তাঁর একজন সমর্থক থাকেন। এরূপ একাধিক প্রস্তাব আসতে পারে। নাম প্রস্তাব শেষ হলে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি একে একে প্রতিটি প্রস্তাবিত নামের সমর্থনে হাত তুলতে বলবেন। হাত গণনার পর যার সমর্থনে বেশী হাত উঠবে তিনিই খলীফারূপে ঘোষিত হন। এটাই জামাতের খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি। যিনি একবার খলীফা নির্বাচিত হন, তিনি আজীবন খিলাফতে আসন থাকেন। ইসলামের প্রাথমিকযুগের খিলাফতেও একই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

এখানে ভোট কারচুপির কোন সুযোগ নেই। নির্বাচন বিধিমালা লংঘনেরও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় নির্বাচন যদি এরূপ হত তবে নির্বাচনী হানাহানির অবসান হত।

একই পদ্ধতিতে খিলাফতের আওতাধীন অন্যান্য জামাতী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে কিছুটা পরিবর্তীতাকারে।

দেশীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন নির্বাচনী বোর্ডের পরিবর্তে মজলিশে সূরার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। হুজুরের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনও হাত তোলার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

দেশীয় ও প্রাদেশিক আমীরসহ তার সেক্রেটারীদেরও নির্বাচন এভাবে হয়। দেশীয় ও প্রাদেশিক জামাতের আওতাধীন স্থানীয় জামাতের নির্বাচন দেশীয় ও প্রাদেশিক জামাতের আমীরের প্রতিনিধী দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাচন পদ্ধতি একই প্রকার। দেশীয় ও প্রাদেশিক এমারত ও স্থানীয় জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের নির্বাচন তিন বৎসর পর পর হয়ে থাকে।

এখন আসুন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার প্রধানদের কি করণীয় তার উপর আলোকপাত করা যাক।

ভবিষ্যতে যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয় তবে তার শাসককে যেমন ন্যায় পরায়ণ, অধিনস্ত ও প্রজাদের প্রতি সদয়চিত্ত হতে হবে, তদ্রুপ অন্যবিধ রাষ্ট্র পরিচালকদেরও ন্যায়পরায়ণ, অধিনস্ত ও প্রজাদের প্রতি সদয় চিত্ত হতে হবে। উভয় রাষ্ট্র পরিচালকদের বিচারকালে ন্যায় বিচার করতে হবে। প্রত্যেক সরকার প্রধানকে দায়িত্বশীল ও প্রজাদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (বুখারী-কিতাবুল আহকাম)

একজন মুসলিম শাসকের বিশেষ কিছু গুণ থাকতে হবে। তাকে নামায কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী, ন্যায় কাজে আদেশ প্রদানকারী, অসৎ কাজে নিষেধ প্রদানকারী হতে হবে। (৩:১৬০; ২২:৪২)

পরবর্তীতে যদি কখনও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, তবে রাষ্ট্র প্রধানের কি পদবী হবে তা তৎকালীন যুগ খলীফা নির্ধারণ করবেন। খলীফা নিজেই যদি রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান হন তবে তো তিনি খলীফারূপেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। অথবা তিনি ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে দিয়েও তা করাতে পারেন। ভবিষ্যতই বলতে পারবে তা' কীরূপ হবে।

রাষ্ট্রের শান্তির জন্য যেমন রাষ্ট্র পরিচালকের উপরেল্লেখিত গুণসমূহ থাকা প্রয়োজন, তদ্রুপ অনুবর্তী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রজাকুলকেও রাষ্ট্রের অনুগত থাকতে হবে। সরকারের তরফ

হতে যখন কোন আদেশ দেয়া হয়, তা কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও নির্দ্বিধায় তা পালন করতে হবে। তার কথা হবে "আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" (২৪:৫২) এই শিক্ষা যেমন ধর্মীয় ক্ষেত্রে তেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তাই কুরআন বলে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমারা আনুগত্য কর আল্লাহর, এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দিবার অধিকারী"। (৪:৬০)

এখানে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্যের দ্বারা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী অনুযায়ী চলার কথা বলা হয়েছে। আদেশ দিবার অধিকারী বলতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাসন ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার আদেশ প্রদানকারীদের বোঝায়। অবশ্য পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবারের বড়দেরও বোঝায়। এই আদেশ অবশ্যই ন্যায় নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রেও এ নিয়ম একইভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় অনুশাসন যদি ইসলামিক হয় তবে তো কোন কথাই নেই। তখন কুরআন, হাদীস বা ইসলামিক অনুশাসন অনুসরণের কোন বাধা থাকেনা। যদি তা না হয় (যেমন, ইংরেজ, হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য কোন জাতি) এবং তারা যদি কুরআন, হাদীস বা অন্য ইসলামী অনুশাসনানুযায়ী চলতে বাধা না দেয় তবে তাদের অনুগত থাকার কথাই উপরের উদ্ধৃত 'তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দিবার অধিকারী' আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) ইংরেজ শাসনের অনুগত ছিলেন ও তাদের প্রশংসা করেছেন। কারণ ইংরেজ শাসকগণ ইসলামী শিক্ষানুযায়ী চলতে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি।

এরূপ শিক্ষাই হযরত রসূলে করীম (সা:)ও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিকে তার শাসকের নির্দেশ পালন করা এবং তার আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য, চাই সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব তার নেই।" (বুখারী, মুসলিম)

এই আনুগত্যের অভাবের কারণেই রাষ্ট্রে, সমাজে এবং পরিবারে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এই আনুগত্যের অভাবের কারণেই দেশে অশান্তি বিরাজ করে। আল্লাহ বলেন, "এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার কোন কাজ কোরনা। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেননা।" (২৮:৭৮)। ইসলাম ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করার নির্দেশ প্রদান করে। (২:২৫২)

হযরত রসূলে করীম (সা:) বলেছেন, "যে ফেৎনার লিপ্ত হয় তাকে সে ফিৎনাই ধ্বংস করে দিবে। যে ব্যক্তি তা হতে মুক্ত অথবা আশ্রয়স্থল পাবে তাকে তা' দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত।" (বুখারী-কিতাবুল ফিতনা)

রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মোকাবেলা করতে হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে এরূপ সমস্যার উদ্ভব হলে ধৈর্যের সাথে তার কার্যক্রম উপেক্ষা করে তার আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। (বুখারী) নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সাথে সদয় ব্যবহার করলে তারা ক্ষতিকর কোন কাজে অগ্রসর হবেনা। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

হযরত রসূলে করীম (সা:) সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেছেন। যেমন এক হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস (রা:) বলেছেন, "আমি (একাধারে) ১০ বছর নবী করীম (সা:) এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনও 'উহ্' পর্যন্ত বলেননি। কখনও একথাও বলেননি যে কেন তুমি এরূপ করলেনা। (অর্থাৎ ধমকের সুরে কোন কথা বলেননি) (বুখারী-কিতাবুল আদব) সকলের সাথে সদয় ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "এবং আল্লাহর তরফ হতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি, সদয় হয়েছ। যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর চিত্ত হতে তবে নিশ্চয় তারা তোমার চারিপার্শ্ব হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত।" (৩:১৬২)

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ঘুষ বন্ধ করতে হবে। কর্মের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তা' দিয়েই পরিবার পরিজন চালাতে হবে। কথায় বলে "কাট ইয়োরকাট একরডিং টু ইয়োর ক্লথ" অর্থাৎ "কাপর অনুযায়ী পোষাক তৈরী কর।" যাকে বলা হয় "আয় বুঝে ব্যয় কর।" ঘুষখোর জীবনে শান্তি পায় না। বরং সে চারিদিকে শত্রু সৃষ্টি করে থাকে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, "এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরনা এবং তাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ কোরনা যাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পারবে। (২:১৮৯)"

এই আয়াতে আল্লাহ ঘুষ দেয়া নেয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দা করেছেন। (কুরআন মজীদ টীকা- ২১৬)

হযরত রসূলে করীম (সা:) বলেছেন, "যে ঘুষ দেয় এবং ঘুষ নেয় উভয়ই অভিশপ্ত।" (আবু দাউদ-ইবনে মাজাহ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)ও ঘুষ গ্রহণ করাকে নিন্দা করেছেন এবং ঘুষ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

(চলবে)

মানবকৃত অপরাধ দানবকেও হার মানায়

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মানব-সাধিত অপরাধ দৃশ্যে আত্মা আঁতকে উঠে। ভয়ঙ্কর ভয় লাগে। পা-যুগল ভয়ে কাঁপতে থাকে। চক্ষুদ্বয়ে শোকাশ্রুর প্লাবন বইতে থাকে। বেদনায় বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। একি! কে করছে এরূপ অপরাধ? মানুষ। তাই নাকি মানুষ! মানুষ কী এমনটি করতে পারে? মানবকে কী এমনটি করা মানায়? পাষণ্ড এ মানবের কৃত অপরাধ দানবকেও যে হার মানায়। গরু, মহিষ, গণ্ডার সে-ও তো তার স্বজাতির কারোর কাছে গিয়ে যৌন চাহিদা মিটায়। কখনো তার ভিন্ন প্রজাতির কাছে গিয়ে জৈবিক চাহিদা মিটানোর নিবেদন করে না। অথচ মানুষ যেকিনা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির রাজা, জ্ঞানের প্রতীক, আদর্শে সর্বেসর্বা। সেকরছে নিকৃষ্ট অপকর্ম! তা হলে আমরা মানুষ কেন? মানবতা কোথায়? মানব দানব স্বভাবের হয়ে ৩৮ বছরের যুবক ৮ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণ করছে! কত জঘন্য সে অপরাধ! কত পাষন্ডরূপ সে অপকর্ম। কত নির্মম নিদারুন সে বিকৃত রুচিবোধ! "হে পাষন্ড! তুমি এরূপ অপকর্ম আমার সনে করো না"– এমন বাক্যটি বলার বয়সও শিশুটির হয়নি। ফ্যাল ফ্যাল দানবটির চোখে তাকিয়ে সে নির্বাক? তার প্রিয় মার কাছে এসেও তার এ বেদনা বলার সুযোগ হয়নি। কেননা অতঃপর তাকে গলাটিপে হত্যা, পুলিশ পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন– কত হৈ চৈ, কত কান্না। ততক্ষণে সেই শিশু স্বর্গালয়ে। হায়রে মানব নামের দানব! কত ভয়ঙ্কর, কত মর্মান্তিক সেই দৃশ্য। পিতামাতা সাংঘাতিকভাবে লজ্জিত ও বেদনার্ত। খোদার আরশ শোকে মুহ্যমান। এমন নিদারুন শোক পিতামাতকে সহ্য করার তুল্য নয়। এমতাবস্থায় আত্মহত্যা করাই যেন তাদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ। কিন্তু এমনটি ইসলামী বিধানে গর্হিত তাই ধৈর্য ধারণই পুণ্যের কাজ।

ব্যথার কাহিনী কেবল এখানেই শেষ নয়। মর্মন্তুদ বিভীষণ কর্মের গল্প আরো আছে। আছে অনেক। শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর গুরুজন। পিতৃতুল্য মনস্বী। তিনি কিনা শ্লীলতাহানী করছেন শিক্ষার্থীদের। পুষ্পতুল্য পবিত্র চরিত্র হনন করছে শিক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলে। তা-ও এ সংখ্যা এক কিংবা দুজন নয় বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ জনের। বিদ্যাদান তার প্রহসন। অপকর্ম তার নেশা- আর পেশা। সন্তাপ আরো আছে। ধর্মীয় বিদ্যাপীঠগুলিতে কলঙ্কময় এরূপ ককুর্মের জোয়ার আরো তীব্র। যেখানে কুরআন ও হাদীস পাঠদান করা হয়। খোদার কালাম শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে এসব অপকর্মের চিত্র আরো মর্মান্তিক আর এ তালিকা আরো লম্বা। এসব স্মরণ করতে গেলে মাথা নুইয়ে আসে। আত্মায় আঘাত লাগে। সুমহান বিদ্যাদান কেন্দ্রে নিকৃষ্টতম অপকর্মের একি ভয়ঙ্কর স্রোত, তা ভাবতেও বিব্রত বোধ হয়। হায়রে মানব, দানব চেয়েও অধম তুমি। একটি কুকুরকে প্রহার করতে গেলেও বিবেকে বাধে, মমতা জাগে। অথচ পবিত্র একটি নারীকে ধর্ষন করছে অতঃপর তাকে জ্বালানী তেলে জ্বালীয়ে আত্মহত্যায় রূপ দেয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। কেবল যৌন নিপড়নই নয় উপরন্তু তাকে গলাটিপে কিংবা অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। সাথে কতক চামচা রাখা হয় একে আত্মহত্যায় রূপ দেয়ার সাক্ষী গোপাল হিসাবে। এসব কেমন নৃশংসতা, কত জঘন্য এই বর্বরতা। মনে হয় এসব না শুনলে কিংবা না দেখলেই যেন স্বস্তির বোধ হতো। এরাই মুসলমান আর এরাই নায়েবে রাসূল। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা-বিধান হলো, "তোমরা কোন ভাবেই কোন রমনীর প্রতি নজর দিও না তা সুদৃষ্টিতেই হোক কিংবা কুদৃষ্টিতে হোক। কেননা পাছে যে কোন সময় তোমাদের পদস্খলন হতে পারে" (আল হাদীস)। অথচ মাদ্রাসার শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক, কোচিং সেন্টারের শিক্ষাদাতা, সমাজের নেতাকর্মী, পুলিশ সদস্য এদের কাছেই মেয়েরা সবচেয়ে বেশী অনিরাপদ।

কলঙ্কের গল্প আরো আছে। নয়ন বন্ডের সহসাথীদের দ্বারা স্ত্রীর সামনে স্বামীকে প্রকাশ্যে দা কিরীচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, ছেলে নেশার তাগিদে মাকে গলাকেটে জবাই করা, যৌতুকের দাবীতে অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক গলাটিপে মেরে ফেলে ঝুলিয়ে আত্মহত্যায় রূপ দেয়ার অপচেষ্টা। পুলিশ প্রশাসনের সদস্য কর্তৃক ইয়াবা জাতীয় নেশার ব্যবসার প্রসারতা, ভূয়া চিকিৎসক সেজে জটিল রোগাগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা করা, অর্থের প্রাচুর্যতার লোভে নকল ওষুধ বানিয়ে জাণিজ্য করা। রাগের ক্ষোভ মিটাতে গিয়ে অন্যের ওপর অপরাধ বর্তানোর কৌশলে প্রতিবেশীর সন্তানকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা। সরকারী বড় কর্তার বড় অপরাধ ঢাকনায় ঢাকার চেষ্টায় বড় অংকের ঘুষ লেনদেন। আর আরেক বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক সে ঘুষ নামের টাকা সুস্বাদে গ্রহণ করা, প্রকৃতির দান যা সবার জন্য সম প্রয়োজন সেই নদীকে দখল করে নদীতে ব্যবসার গদি বসিয়ে নদীকে খাল বানিয়ে অথবা খালকে নালা বানিয়ে পরিবেশকে সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত করা এমনি ধরণের গণনাতীত সংখ্যক অপরাধ সমাজে সয়লাব। নিত্যদিন নব ধরণের অচিন্ত্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

এতো হলো স্বদেশের কিছু কথা। যদি বহির্বিশ্বে নজর দেই তবে সেখানে দেখব অপরাধের ভয়ঙ্কর রূপ। অবৈধ সন্তান জন্মে ও সমকামিতায় স্বাধীনতা দিতে হবে। এসবকে আইনগতভাবে বৈধতা দিতে হবে। এরপক্ষে চতুরদিকে শ্লোগান। দিতে হবে অধিকার। ফলেই শান্তিকামী সাধারণ জীবন আজ সাংঘাতিকভাবে আতঙ্কগ্রস্থ, ভীত সন্ত্রস্ত। কখন কার সাদরের সন্তান নাজানি কখন কোন্ বিপদে অহেতুক জড়িয়ে পড়বে সে শঙ্কায় সাধু স্বভাবের অভিভাকগণ বিস্তর অস্থির। ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল ইত্যাদি বদনেশার গ্রাস প্রতিটি ঘরের দ্বারে কড়া নাড়ছে। নিষ্কলুষ যুবক যুবতীদের অনেকেই সেই দুরন্ত নেশার আহ্বানকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়ে সর্বনাশায় পা-বাড়াচ্ছে। আলিঙ্গন করছে নিশ্চিত ধ্বংসকে। ফলে বাবার সুখের সংসার আরে সখের সংসার সর্বশান্ত হচ্ছে আর্থিকভাবেও, মর্যাদার দিক থেকেও। সর্বৈব ধ্বংস করছে প্রতিবেশীর হক।

মানুষ মানুষের জন্য। মানুষ আল্লাহর জন্য। মানুষ তার স্রষ্টা ও তার সৃষ্ট মানুষের মনস্তুষ্টি যোগাবে ইহাই তার নৈতিক (সড়ৎধষ) দায়িত্ব। সে মানব কখনো দানবীয় স্বভাব প্রদর্শন করতে পারেনা। পুরুষ নারীদের অভিভাবক। নারীরা পুরুষের সহায়ক বাহুবল। সুতরাং নারীদের লজ্জা সম্ভ্রমকে হেফাজতে রাখা পুরুষের আধ্যাত্ম দায়িত্ব। একটি নারী কখনো একটি নরের অবৈধ কামনা-বাসনার খোরাক হতে পারে না। তা-ও আবার অপরিণত বয়সে। এমনটি অত্যন্ত নিন্দিত ও ঘৃণীত কাজ। খোদা আক্ষেপের সাথে বলছেন, "এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না? (৫৬:৬৩)।

সুতরাং মানুষ হয়ে মানুষের সাবলিল জীবনকে ধ্বংসে ঠেলে দেয়ার মত কোন কাজ মানুষ কখনো করতে পারে না। এতে ঐশী অনুমোদন নেই। ইহা অনবদ্য সত্য। এই নিখাদ সত্যকে বাদ দিয়ে সমাজ গঠিত হতে পারেনা। আমি প্রত্যেকের জন্য আর প্রত্যেকেই আমার জন্য। সুতরাং প্রত্যেকেই আমার তরফ হতে সহানুভূতি সহমর্মিতা পাওয়ার অধিকার রাখে। আমি একা একটি বাসের যাত্রী, তাই বলে আমি ঐ বাস চালকের পাষবিক চাহিদার খোরাক হতে পারিনা। বরং ঐ সময় আমি ঐ বাস চালক ও তার সহযোগীর অনুকম্পা ও সহযোগিতা প্রাপ্তির দাবীদার। তার স্নেহ দয়া মায়া ও সশ্রদ্ধার সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। তা না করে সে যদি পাশবিকতার তাগিদে আমাকে আক্রমণ করে তবে তা হবে নিতান্তই নিদারুন। সুতরাং সে দানব, অমানব। সে পশু, সে পিশাচ অস্পৃশ্য। খোদার কুদরতীয় পরাক্রমশক্তি এমন দুর্জন দুরাচারকে নির্মমভাবে খন্ডবিখন্ড করে নিঃশেষ করুক এমনটি হবে আমাদের আরাধ্য। কারণ সে মানুষ নামের কলঙ্ক। সে নরাধম। সে কুৎসিৎ কুষ্মান্ড। যাদের কাছে মানুষের মান সম্মান চরিত্র, মানুষের সাবলীল জীবন অনিরাপদ তারা নিশ্চয় দুর্জন। অমানুষ। আত্মা তাদের অশুচি। জাগতিক শাসন কিংবা বিচার ব্যবস্থায় এমনদেরকে বিমল করা আদৌ সম্বভ নয়। এরূপ দুশ্চরিত্র দুরাচার নরখাদকদের ঐশী জগত হতে আগত কোন শক্তি কর্তৃক কঠিন অনুশাসনের প্রয়োজন। কারণ সর্বস্তরেই যেখানে দুশ্চরিত্রের গ্রাস ও দুর্নীতি বিরাজমান সেখানকার এমন কুজনদের জাগতিক শাসন দ্বারা সুষ্ঠু বিচার হওয়ার আশা অবান্তর। কারণ লোহাও বাঁকা হয়েছে সাথে হাতুড়িও বাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং সে হাতুড়ির দ্বারা লোহা সোজা করা আদৌ সহজ সাধ্য নয়। এমতে সমাজ এখন মানসিক ভাবে সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন। উন্মাদ জগতের বিচারিক ব্যবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। মানসিক পরিবর্তন আনয়ন ছাড়া এমন অধম চরিত্র বিশিষ্ট সমাজকে সভ্য সমাজ হিসাবে গড়ে তোলা নিতান্তই অসম্ভব।

প্রিয় পাঠক! বহু পরে, বহু কষ্টে, বহু কিছু হারিয়ে এতক্ষণে আমরা যথা মন্তব্যে ফিরে এসেছি। মানুষকে মানসিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এটা যুগেরও কথা। এটা স্বর্গীয় শাসনেরও অভিপ্রায়। মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন। খোদা মানুষের প্রতি অসম্ভবভাবে অনুকম্পাশীল। কাজেই তিনি যথাসময়ে মানুষের আত্মার চাহিদার তাগিদে যথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তা-ও আবার এখনই নয় বরং শতাধিক বছর পূর্ব হতেই তা চলমান। সাধু স্বভাবের সজ্জনেরা ইতোমধ্যেই তাঁর পক্ষজনের স্নেহের আহ্বান

কে অন্বেষণ পূর্বক লাব্বায়েক বলেছেন। পক্ষান্তরে অবুঝ দুরাত্মার দল তাঁর চরম বিরোধিতা করছে।

তারা চিরাচরিত স্বভাবে বলছে, এ ব্যবস্থাপনার অনুসারী আহমদীরা অমুসলমান, কাফের। সুতরাং তাদেরকে কতল কর। কতল করা পুণ্যের কাজ। যায়েজ নির্দেশ। এমনি ধরণের ইসলাম বিধান বিরোধী ফতওয়া দিয়ে খোদাপ্রেমী নীরহ নির্মল আত্মাধারীদেরকে খোদার জ্যোতি প্রাপ্ত হতে বিমুখ বিরাগভাজন করে রেখেছে। শান্তির পথকে আগল দিয়ে বন্ধ করে অশান্তির আগুন জ্বালাচ্ছে। শয়তানী প্রতিকুলতায় মানুষ স্বর্গীয় সুধাপান হতে বঞ্চিত হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। অসাধারণ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। অসম্ভব অমানবিক কাজ করছে। খোদা সৃষ্ট মানুষ খোদা হতে বঞ্চিত। তাই মানুষ যাচ্ছে– তাই করছে। পরস্পরের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় দগ্ধ হয়ে এক্ষণে মানুষ ভাবছে, খোদা বলতে কেউ নেই। সুতরাং খোদার শাসনও পৃথিবীতে নেই এমনই মনোবৃত্তি মানুষের। মা বঞ্চিত শিশু যেমন বলগাহীন যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় আর অবাঞ্চিত অসম্ভব কাজ করে ফেলে তেমনিভাবে মানুষ আজ বলগাহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যেমনটি খুশি তেমনটিই করছে। কিন্তু প্রেমময় খোদা মানুষের প্রতি ততটাই মমতাময়ী যেমনি একজন মা তার সন্তানের প্রতি অদুরিণী।

তাই খাকসার পুনরায় সেকথাই বলছি, যা আমি আমার প্রতিটি লেখার শেষাংশের বলে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের কথা। সত্যের বারতা। স্বর্গের ডাক। আত্মার খাদ্যের সন্ধান। মানসিক প্রশান্তি লাভের অসম্ভব সুন্দর পথ। খোদা বঞ্চিত

মানুষদের খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জ্যোতির্ময় ব্যবস্থাপনার কথা। কথা আমার সেই একটাই। যা কুরআন ও হাদীসের কথা। আর ইহাই আসল কথা। এ কথাই মানুষকে মানসিক প্রশান্তি দিতে সক্ষম। সকল প্রকার অপকর্মের আড্ডাখানা হতে বিমুখ করে স্বর্গকর্তা খোদাকে পাইয়ে দিতে পারে।

তাই বলছি, এ আহ্বানকে খামখেয়ালে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হবেন না। কারণ তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন। তাঁর আগমন মোটেই কোন তিলতুল্য ঘটনা নয়। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা সবার জন্য সর্বনাশের কারণ। বিষয়টি বিবেক দিয়ে বিবেচনা করতে সবিনয় অনুরোধ করছি। তাঁর মহান বাক্য অনুসরণই কেবল মানুষকে মহৎ করতে পারে। তিনি (আ.) বলছেন, "যে স্বামী স্ত্রীর সাথে এবং যে স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করে না, আত্মীয়স্বজনদের সাথে নম্র ও ভদ্র নহে সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক প্রকার পাপ যা যত ছোটই হোকনা কেন তা বিষ, তা পান করে মানুষ কোনভাবেই জীবিত থাকতে পারে না। অতিরিক্তি দুর্নীতিপরায়ণ ও নির্দয় জীবন অভিশপ্ত। খোদা তোমাদের এক প্রিয় সম্পদ, তাঁর সমাদর কর। যদি তোমরা তার মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে তবে সংসারের জন্য এতটা আত্মহারা হতে না। তোমরা তাঁর দরবারে আত্মসমর্পণ কর। তা হলে তোমরা সকল প্রকার আগুন হতে রক্ষা পাবে। তোমরা কোনভাবেই লুতের জাতির অনুরূপ হয়োনা। পরিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। নূহের যুগের সাদৃশ বিপদ তোমাদেরকে প্লাবিত করে ছাড়বে" (পুস্তক: আমাদের শিক্ষা)। তদীয় পুত্র জামাতের পবিত্র ব্যক্তিত্ব বলেছেন, "যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতি সমূহের সংশোধ হতে পারে না।" সুতরাং হে যুবকগণ! তোমরা পবিত্রাত্মার অধিকারী হও। চরিত্রহীন কুৎসীৎ কর্মে লিপ্ত হয়োনা। জামাতে আহমদীয়ার শান্তির বাণী শ্রবণ কর। বিনিময়ে তোমাদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে। সকল প্রকার অপকর্ম করা থেকে পবিত্র থাকতে শাক্তি লাভ করবে।

হে উদভ্রান্তগণ! আকুল আকুতি জানাচ্ছি, অপকর্মের প্রাবল্য থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় দোয়ায় নিমগ্ন হও। খোদার সাথে সন্ধি কর। তা হলে জাগতিক সকল প্রকার পাপ আপনা হতে ছুটে পলাবে। "যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক (অবধারিত) আছে" (আল্ কুরআন ২২: ৫১)। অন্যথায় এমনদেরকে খোদার অসাধারণ কঠিন শাস্তি গ্রাস করবে। যেমনটি অন্যত্র খোদা বলেছেন, "যে কেউ কেবল ইহজীবনের সুখ সম্ভোগের প্রত্যাশী হয় তাদেরকে সত্তর এখানে তা দেই যা আমরা ইচ্ছা করি; এরপর আমরা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে দেই, যাতে সে নিন্দিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জ্বলতে থাকবে" (আল্ কুরআন ১৭ : ১৯)।

প্রণিধান করুন, ইহকাল হলো পরকালের বুনিয়াদ গড়ার ক্ষেত্রস্থল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিন্দিত অপকর্ম কখনো আত্মাকে নন্দিত করবে না।

৪৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সময়সূচী ও নির্দেশনা

বাছাই পর্ব: কুরআন তিলাওয়াত, বক্তৃতা ও নযম
(১৯.০৯.২০১৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। যারা এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে পারবেন না তাদের জন্য বাদ ফজর সুযোগ থাকবে)। সরাসরি হাদীস, ক্বাসীদা ও দরস।

মূল প্রতিযোগিতার সময়সূচী:

কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা: ১ম অধিবেশন (২০.০৯.১৯-শুক্রবার)।

হাদীস ও দরস প্রতিযোগিতা: ২য় অধিবেশন (২০.০৯.১৯-শুক্রবার)।

ক্বাসীদা প্রতিযোগিতা: ২০.০৯.১৯ শুক্রবার হুযুরের খুতবা এবং মাগরিব ও ইশার জমা নামাযের পর।

নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা: ৩য় অধিবেশন (২১.০৯.১৯-শনিবার)।

যেসব বিষয় মানবণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে:

বক্তৃতা: সময়-৫ মিনিট। উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, উদ্ধৃতি [কুরআন, হাদিস, মসীহ মাওউদ (আ.) ও অন্যান্য], সময়ের নির্দিষ্টতা, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা।

দরস: সময়-৮ মিনিট। পটভূমি/ শানে নযুল, আয়াত অনুযায়ী অর্থ ও তার ব্যাখ্যা এবং উপসংহার (ব্যাখ্যার মূল্যায়ন)।

নযম: উপস্থাপনা, সুর, মুখস্থ, উচ্চারণ।

ক্বাসীদা: মুখস্থ, সুর, উচ্চারণ।

হাদীস: আরবী ও তার অর্থ।

নাসেরাতদের জন্য নির্দেশনা

যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন, তাদেরকে অবশ্যই অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত পরিশোধকৃত চাঁদার রশিদ/সেক্রেটারী মালের প্রদত্ত সনদ আনতে হবে।

পরীক্ষা: ১৯.০৯.২০১৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সকল নাসেরাতের কুরআন তিলাওয়াতের বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ২০.০৯.২০১৯ রোজ শুক্রবার ৮.৩০ ঘটিকায় নাসেরাতদেরকে মসজিদের ৩য় তলায় লিখিত পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।

অধিবেশন: ২০.০৯.২০১৯ রোজ শুক্রবার ৩.০০ ঘটিকায় নাসেরাতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

তালীম দপ্তর
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ

মুতাশাবিহাত (রূপক বর্ণনা)

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

"তিনিই তোমার ওপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, যেগুলি এই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক (এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী)। কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুকরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক। অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং জ্ঞানে পরিপক্ষ লোকগণ; তাহারা বলে, আমরা ইহার ওপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত। বস্তুত: ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না" (৩:৮)। "এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূলরূপে (এই পয়গামসহ প্রেরণ করিবেন) যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অত:পর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র আদেশে আমি অন্ধ এবং কুষ্ট রোগীকে নিরাময় করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব এবং তোমরা কি খাইবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মু'মিন হও" (৩:৫০। "এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও (২:৬৬)।

"তুমি বল, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়া উহা অপেক্ষা ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব? (শুন) যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার ওপর তিনি ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শুকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে ইহারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট" (৫:৬১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত সব কটি কথাই রূপক। পাখীর অবস্থার অনুরূপ বানিয়ে উড্ডীয়নশীল করা। অন্ধ বলতে আধ্যাত্মিক অন্ধ এবং কুষ্ট রোগী বলতে অত্যাধিক সংসারাসক্তগণকে এবং মৃত বলতে আধ্যাত্মিক ভাবে মৃতদের বুঝানো হয়েছে। বানর বলতে বাদর স্বভাব এবং শুকর বলতে নোংরামী, অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ভাষাতেই এ ধরণের রূপকের প্রচলন আছে, যার ভাবার্থ গ্রহণ করতে হয়। এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকে শেরে বাংলা বলা হয়, তাই বলে তিনি শের হয়ে যাননি। শিক্ষকরা দুর্বল ছাত্রদের গাধা বলে সম্বোধন করেন, তাই বলে তারা সত্য সত্যই গাধা হয়ে যায় নি। এ সব রূপককে দ্ব্যর্থহীন অর্থে ব্যবহারকারীরা নিজেদের এবং জনগণকে প্রকৃত অর্থ হতে বঞ্চিত রাখে এবং এ নিয়ে দলাদলিও সৃষ্টি করে থাকে। অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং জ্ঞানে পরিপক্ষ লোকগণ। "পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না" (৫৬:৮০)।

অতএব ভুল অর্থ বর্ণনাকারী প্রত্যেকেরই নিজেদের অহংকার পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত প্রকৃত আলীমদের অনুসরণ করা দরকার। বিশেষ করে এ যুগের সংস্কারক যুগ ইমাম, ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আনুগত্যে যুগ খলীফার অধীনে পবিত্র কুরআনের সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করে কুসংস্কারের সীমাবদ্ধতা থেকে বেড়িয়ে এসে নিজেদের মুক্ত করতে ধৈর্যের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া দরকার। পবিত্র কুরআনে বিন্দুতে সিন্ধুর জ্ঞান রয়েছে অনন্তকাল ব্যাপী যার বিস্তার ঘটবে। এসবের ব্যাখ্যা শিখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা পবিত্র কুরআনের মূলতত্ত্ব পাঠোদ্ধারে ভুল পথে পরিচালিত হবে ইহাই স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআনও তাই বলে। অজ্ঞ বক্তাদের তাক্‌ওয়া বিবর্জিত লাগম ছাড়া বক্তব্যে প্রভাবিত হলে লাঞ্ছনা বরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন বলে "যাহারা দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুইয়া) আল্লাহ্‌কে স্বরণ করে এবং আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রভু! তুমি এই সব বৃথা সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর" (৩:১৯২)। অতএব আগুনের আযাব হইতে রক্ষা পেতে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা দরকার। হুযূর (সা.) খাতামান্নবীঈন রহমাতুল্লিল আলামীন যিনি সহস্র সহস্র মৃতকে জীবিত করেছিলেন বটে কিন্তু ওফাত প্রাপ্ত একজনকেও নয়। তাঁর (সা.) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ".....তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ডাকে যখন সে আমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করতে পারে" (৮:২৫)।

এখানে দেখা যায় যাদের উদ্দেশ্যে আয়াত বর্ণিত হয়েছে তারা সবাই জীবিত, আর তাদেরকেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে তিনি (সা.) তাদের জীবিত করেন। এ জীবন দান অবশ্যই আত্মীক জীবন। ঈসা (আ.) এর মাহাত্ম্য এর উর্ধ্বে যেতে পারে না, যদি ঈসা (আ.) প্রকৃত মৃতকে (ওফাত প্রাপ্তদের) জীবিত করে থাকেন তবে খাতামান্নবীঈনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে কোথায়? বিশ্বাস করুন পবিত্র কুরআন খাতামাল কুতুব অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)ই খাতামান্নবীঈন তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার মত কেউ হওয়ার নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশিত জীবন প্রকৃত পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যা চির গতিময় এবং যাকে অতিক্রম করার যোগ্যতা কারো নেই, ছিলও না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদের পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশিত পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সৌভাগ্য অর্জনকারীতে পরিণত করুন এবং খায়রে উম্মত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (২০১৯-২০২২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্য হয়ে জামাতের সেবা প্রদানের জন্য ২০১৯-২০২২ মেয়াদে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এই ঐশী জামাতের প্রকৃত সেবক হবার সৌভাগ্য দান করুন, আমিন।

নং	নাম	পদবী
১)	মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ
২)	মোহতরম অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী	নায়েব ন্যাশনাল আমীর
৩)	মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন	নায়েব ন্যাশনাল আমীর
৪)	মোহতরম মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান	নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুহাসিব
৫)	মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্	নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী জায়েদাদ
৬)	মোহতরম অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক	নায়েব ন্যাশনাল আমীর
৭)	মোহতরম শাহান শাহ্ আজাদ জুম্মান	নায়েব ন্যাশনাল আমীর
৮)	মোহতরম মাহমুদ আহমদ বিপ্লব	নায়েব ন্যাশনাল আমীর
৯)	মোহতরম মাহবুবুর রহমান	জেনারেল সেক্রেটারী
১০)	মোহতরম ইমতিয়াজ আলী	সেক্রেটারী তবলীগ
১১)	মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	সেক্রেটারী তরবিয়ত
১২)	মোহতরম জামাল উদ্দিন আহমদ	সেক্রেটারী তালীম
১৩)	মোহতরম আলহাজ্জ মাহবুব হোসেন	সেক্রেটারী ইশায়াত (প্রকাশনা)
১৪)	মোহতরম খায়রুল হক	সেক্রেটারী ইশায়াত (অডিও-ভিডিও)
১৫)	মোহতরম মোহাম্মদ তসাদ্দক হোসেন	সেক্রেটারী রিশতানাতা
১৬)	মোহতরম আহমদ তবশীর চৌধুরী	সেক্রেটারী উমুরে খারেজা
১৭)	মোহতরম শহীদুল ইসলাম বাবুল	সেক্রেটারী উমুরে আমা
১৮)	মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুর রহিম	সেক্রেটারী যিয়াফত
১৯)	মোহতরম জি. এম. ফিরোজ আহমদ	সেক্রেটারী ফাইন্যান্স
২০)	মোহতরম নঈম আলম খান	এডিশনাল সেক্রেটারী ফাইন্যান্স
২১)	মোহতরম সারোয়ার মোরশেদ	সেক্রেটারী ওসায়া
২২)	মোহতরম ইনসান আলী ফকির	সেক্রেটারী তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী
২৩)	মোহতরম শফিকুল হাকিম আহমদ	সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ
২৪)	মোহতরম মাহবুবার রহমান	সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
২৫)	মোহতরম মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমিন	সেক্রেটারী এডিশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নওমুবাঈন
২৬)	মোহতরম হাসিব আহসান রতন	সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
২৭)	মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুস সোবাহান	সেক্রেটারী যিরাআত
২৮)	মোহতরম বশির আফজাল আহমদ খান চৌধুরী	সেক্রেটারী সানাত ও তিজারাত
২৯)	মোহতরম এস এম আব্দুল আজিজ	আমীন
৩০)	মোহতরম আহমদ দাউদ	ইন্টারনাল অডিটর
৩১)	মোহতরম মুনাদিল ফাহাত	সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রকাশক:
আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

কিশোরগঞ্জ কটিয়াদি মজলিসে ১৬তম জেলা ইজতেমা-২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ৫ ও ৬ জুলাই ২০১৯ তারিখ শুক্র ও শনিবার ১৬তম জেলা ইজতেমা কিশোরগঞ্জ কটিয়াদি মজলিসের মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জেলা ইজতেমায় কেন্দ্র থেকে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব হালিম আহমদ হাজারী নায়েব সদর ও হাসিব হাসান রতন কায়েদ তালীম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ও আসর নামায জমা করার পর খাওয়া দাওয়া শেষে বিকাল ৩টা থেকে ইজতেমার কর্মাদি শুরু হয়। জনাব হালিম আহমদ হাজারী ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ হান্নান সাহেব যথাক্রমে মজলিস ও দেশের পতাকা উত্তোলন করেন। অত:পর সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি আহাদ পাঠ ও দোয়া করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব, স্বাগত ভাষণ দান করেন জেলা নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, তরবিয়ত বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব হাসিব হাসান রতন সাহেব। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে খেলাধুলা পর্ব শুরু হয়। তা পরিচালনা করেন এডভোকেট আনিছুজ্জামান সাহেব। খেলাধুলার মধ্যে ছিল ইন আউট, বালিশ বদল, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ। উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানে রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব ইঞ্জিনিয়ার হাফেজুর রহমান সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা ৬ট থেকে ৭টা পর্যন্ত ছিল হুযূর (আই.) খুতবা শ্রবণ অনুষ্ঠান। খুতবা শ্রবণের ওপর মৌখিক পরীক্ষায় যারা ভাল করেছেন তাদেরকে কুরআন মজীদের শেষ ১৬টি সূরার বঙ্গানুবাদ পুস্তকটির একটি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রাতের খাবার অত:পর নিদ্রা যাপন, ভোর ৩টায় বেদারী। ভোর ৩.৩০ হতে ৫.০০ পর্যন্ত নামায তাহাজ্জুদ ও ফজর শেষ করে ব্যক্তিগতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়

০৬-০৭-২০১৯ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ৬-৩০ মনিট থেকে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। বিষয় ছিল কুরআন তেলাওয়াত মুখস্ত ও নাযেরা পাঠ। অত:পর গোসল খাওয়া দাওয়া ও যোহর আসর নামায জমা আদায়।

সমাপনি অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন, কেন্দ্র থেকে আগত মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী নাসের জনাব কারী ফজলুল হক ও নযম পরিবেশন করেন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগী জনাব মোখলেছুর রহমান সাহেব। সভাপতি সাহেবের বক্তব্যের পর তরবিয়তী বক্তৃতা প্রদান করেন হাসিব হাসান রতন ও সৈয়দ আনোয়ার আলী এবং এম এ হান্নান সাহেব। সবশেষে বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম আলা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব। অত:পর সভার সভাপতি সাহেব বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। আহাদ পাঠ দোয়া শেষে সভাপতি সাহেব ১৬তম

ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত ইজতেমায় ৭টি মজলিসের মোট ৭৬ জন আনসারুল্লাহ্ ভাই উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সবার সার্বিক কল্যাণের জন্য বন্ধুদের নিকট খাস দোয়ার আরজ করছি।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেলা নাযেম আলা, মসলিস আনসারুল্লাহ্

বিবাহ সংবাদ

গত ১৭/০৫/২০১৯ তারিখ সাদিয়া সুলতানা সিনথিয়া, পিতা- অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন, সাগরপাড়া, বল্লভগঞ্জ, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-এর সাথে শরীফ আহমেদ পোষণ, পিতা- মোহাম্মদ কবীর আহমেদ ২৮৯, পূর্ব নাখালপাড়া, ঢাকা- এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯০।

গত ১৬/০৪/২০১৯ তারিখ ফেরদৌসী বেগম, পিতা- মোহাম্মদ মজিবর রহমান, চাঁনতারা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল-এর সাথে মোহাম্মদ কাওসার আহমদ সিকদার, পিতা- ইয়াকুব সিকদার, কাউনিয়া, বেতাগী, বরগুনা-এর বিবাহ ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯১।

গত ২৪/০৫/২০১৯ তারিখ সালেহা আলম (ববি), পিতা- এ.বি.এম শফিউল আলম, ১৫৯, সিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে লতিফুল ইসলাম পিতা- নিয়ামুল ইসলাম, নারায়ণপুর, পাংসা, রাজশাহী-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯২।

গত ১১/০৬/২০১৯ তারিখ শারমিন আক্তার রোকসানা, পিতা-আনিছ মিয়া, কাজিপড়া দরগা মহল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা-এর সাথে সোহেল আহমদ চৌধুরী মরহুম আব্দুল করীম চৌধুরী, জামালপুর, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৩।

০৮/০৩/২০১৯ তারিখ মোসাম্মাৎ আনিকা ইয়াসমিন, পিতা- মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, ১০২/২, আর, সি, আর, সি, রোড, কোর্টপাড়া, জেলা-কুষ্টিয়া-এর সাথে শোয়েব আহমদ খন্দকার, পিতা- মোস্তাক আহমদ খন্দকার, গ্রাম-দাক্ষিণ মোড়াইল পো:+থানা+ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৪।

০৫/০৭/২০১৯ ইশরাত জাহান (মীম), পিতা- কবির আহমদ মৃধা, পূর্ব কুকুয়া, পোষ্ট সহরাওয়ার্দী হাই স্কুল উপজেলা- আমতলী, জেলা-বড়গুনা-এর সাথে ইসমতউল্লাহ্ মিয়াজী, পিতা-জহির আহমদ মিয়াজী, গ্রাম+পোষ্ট তারুয়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৫।

০৭/০৬/২০১৯ শিমা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সাফিউল ইসলাম, গ্রাম: জমাগ্রম, পো: বাটড়া থানা: পাটগ্রাম, জেলা; লালমনিরহাট-এর সাথে মোহাম্মদ আতা এলাহী (শুভ) পিতামৃত: দৌলত আহমদ, গ্রাম: শিবপুর, ডাকঘর;শ্যামপুর-এর বিবাহ ১,০১,১০১/- (একলক্ষ এক হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৬।

১৮/০৩/২০১৮ ফায়জা সুলতানা (ইমা), পিতা-মোহাম্মদ দাউদ আহমেদ বোখারী, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ মহিদুল হক, পিতা- মাষ্টার জিয়াউল হক, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৭।

১৫/০৩/২০১৯ শ্রাবনি আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ জামাল মুন্সী, গ্রাম+পো: সহিলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ সোহাগ সরকার, পিতা-আব্দুল আজিজ সরকার গ্রাম; ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৮।

৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখের জুমুআর খুতবায় 'বিবাহ সংক্রান্ত' বিষয়ে হুযূর (আই.) দিক নির্দেশনা

"মহানবী (স.)-এর এই কথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, **'চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়: প্রথমত তার সম্পদের কারণে, দ্বিতীয়ত তার বংশের কারণে, তৃতীয়ত তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং চতুর্থত তার ধার্মিকতার কারণে। অতএব তোমরা ধার্মিক মেয়ে নির্বাচন কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।'** এ কথা যদি ছেলেরাও এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও সামনে রাখে, তাহলে মেয়েরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই ধর্মকেই প্রাধান্য দেবে।

আর ধর্ম যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ যা মেয়ে এবং ছেলে এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে পরস্পরের মাথায় দানা বাঁধে, তা দূর হয়ে যাবে। আর যেই ছেলে ধার্মিক মেয়ের সন্ধানে থাকবে আর ধর্মকে অগ্রাদিকার প্রদান করবে, তাকে নিজের আমল বা ব্যবহারিক আচার-আচরণও ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত করতে হবে। আর যে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তার ঘরে বিনা কারণে ছোট ছোট বিষয়ে ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না।"

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 2nd & 3rd Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

31st July & 15 August, 2019 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

MTA TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)